প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম

আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ

পুঁজিবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে মসৃণ বিশ্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন যে অসম্ভব সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। তৃতীয় ধারার যে বিকল্প সে ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এসে গেছে সাম্যবাদের পতনের পর থেকেই। এই তৃতীয় ধারা তথা ইসলামের স্বরূপ নতুন ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়েছে ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচের 'Islam Between East and West' শীর্ষক রচনায়। আমরা তাঁকে 'সালাহুদ্দীন' হিসেবে জানতাম। এই গ্রন্থের মাধ্যমে জানলাম যে, তিনি 'সলোমন'-ও বটেন।

স্নেহভাজন ইফতেখার ইকবাল কষ্টসাধ্য পরিশীলন ও পরম নিষ্ঠার সাথে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের জন্ম দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম করুণায় এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল করুন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আমার মনে হয় আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ-এর ইসলাম সংক্রান্ত বইটি লেখার পেছনে দু'ধরনের প্রণোদনা কাজ করেছে। এক, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্যে ইসলাম ভীতির প্রেক্ষাপটে ইসলামের মর্মবাণী ও শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা। দুই, হুমকির মুখোমুখি স্বগোত্রীয় (এমন কি সারা বিশ্বের) মুসলমানকে ইসলামের ভিত্তিতে আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান দেয়া। বসনীয় মুসলমানদের বিপর্যয় যে শেষোক্ত প্রণোদনার উৎস তা বলা বাহুল্য। অবশ্য জাতীয় সঙ্কটকালে এমনি ধর্মনির্ভর আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া ইতিহাসে নতুন কিছু নয়; অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই আলীয়া

www.pathagar.com

ইজেতবেগোভিচ-এর প্রয়াসকে এমনি একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে তাঁর রচনার একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা। এমন একটি বইকে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে ভাষান্তরণের মাধ্যমে তুলে দেয়ার কাঙ্ক্ষিত কিন্তু কষ্টসাধ্য দায়িত্বটি পালন করার জন্যে ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র ইফতেখার ইকবাল ধন্যবাদার্হ। ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের কাছে বইটি সাদরে গৃহীত হোক-এই শুভ কামনা রইল।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
চেয়ারম্যান
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইফতেখার ইকবাল। জন্ম মার্চ ১৯৭৫, যশোরে। নব্বই দশকের শুরু থেকে লেখালেখি করছেন। কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও অনুবাদ সাহিত্যে স্বচ্ছন্দ। সঙ্গীত, উত্তর-আধুনিকতা, নয়া উপনিবেশবাদ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন এবং লিখছেন। অনুবাদ করেছেন এ্যাবারক্রম্বী, জোসেফ কনরাড, টি এস এলিয়ট, টেড হিউজেস, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস প্রমুখের গদ্য ও কাব্য রচনা। লিখেছেন 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক', 'ইনকিলাব', 'বাংলাবাজার পত্রিকা', 'The Bangladesh Observer', 'The Daily New Nation' এবং 'বই', 'মাটি' প্রভৃতি দৈনিক ও সাহিত্যপত্রে। সম্পাদনা করেছেন 'সূর্যাবর্ত' নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্যপত্র। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়নরত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম

আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ
রূপান্তর
ইফতেখার ইকবাল

আমান পাবলিশার্স ঢাকা

www.pathagar.com

©
ইফতেখার ইকবাল
American Trust Publications

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪০৩ এপ্রিল ১৯৯৬

প্রকাশক
খালেদ-বিন-কবীর
আমান পাবলিশার্স বাড়ি-১ রোড-১১০ গুলশান ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

মুদ্রণ
চৌকস ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা-১০০০
মূল্য ৯০ টাকা

ISBN 984-30-0199-0

Prachya Praschattya O Islam — Bengali translation of Dr. Alija Ali Izetbegovic's "Islam Between East and West." Translated by Iftekhar Iqbal. Published by Khaled-bin-Kabir from Aman Publishers, House no. 1, Road no. 110, Gulshan, Dhaka 1212
Tel : 889359. Fax : 814415.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ডাঃ সরওয়ারুল ইসলাম
উম্মে হাসনাত সিদ্দিকা
আমার প্রাণের প্রস্ফুটক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কোন মৌলিক রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে অনেক সময় মূল লেখকের বক্তব্যকে অপরাপর চিন্তাধারার সাথে মিলিয়ে নিজের কাছে খোলাসা করে নিতে হয়। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ, অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. জামাল আরা রহমান, অধ্যাপক ফকরুল আলম, ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম–এর নিকট যখনই যে উদ্দেশ্য ও ঔৎসুক্য নিয়ে গিয়েছি, ফিরে এসেছি পরম পরিতৃপ্তি ও পূর্ণতার বোধসহ; তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধাস্পদ সৈয়দ আশরাফ আলী বেশ কিছুদিন আগেই বংলাদেশের সুধী মহলের সাথে এই বইটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বইটির বাংলা রূপান্তরের কথা শুনে তিনি সানন্দ মন্তব্য করেছেন; তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। ড. রাশিদা খানম ও জনাব শাহ আবদুল হালিম অনুবাদের অংশ বিশেষ পড়ে ও মন্তব্য করে তাঁদের নিকট আমার স্নেহের ঋণকেই বাড়িয়েছেন। অধ্যাপক আবদুল গফুর (ইনকিলাব), সৈয়দ জিল্লুর রহমান (The Bangladesh Observer), কবি আল মুজাহিদী (ইত্তেফাক) ও 'পালাবদল' কর্তৃপক্ষ অনুবাদের অংশ বিশেষ ও আলোচনা ছাপিয়ে বাধিত করেছেন। জনাব কাজী ফজলুল করিম, কবি ইশারফ হোসেন ও বন্ধুবর শামসুল আলম এই অনুবাদের সূত্রে অশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। American Trust Publications, Indiana, USA-এর পক্ষ থেকে Mrs. Constance Marzouk নিঃশর্ত অনুমতি না দিলে এই বাংলা সংস্করণের প্রকাশনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার অভিচেনা শুভাকাঙ্ক্ষী ও সতীর্থদের নাম উল্লেখই যথেষ্ট নয়; তাঁদের সকলের শুভেচ্ছার দানকে অন্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে রাখলুম। পরিশেষে আমার অগ্রজ শ্রদ্ধাভাজন জনাব খালেদ–বিন–কবীরকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি এই অনুবাদ প্রকাশনার সমস্ত দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছাড়া এত সত্বর এই আয়োজন পূর্ণতা পেত না।

ই. ই.

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ
ভূমিকা
অনুবাদকের কথা
বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে

প্রথম খণ্ড : ধর্ম বিষয়ে সাধারণ বিবেচনা

প্রথম অধ্যায় : সৃষ্টি ও বিবর্তন ১
ডারউইন ও মিকেল্যাঞ্জেলো
মৌলিক আদর্শবাদ
মানবতাবাদের অর্থ

দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কৃতি ও সভ্যতা ১৭
দ্বৈতবাদের স্রোত
শিক্ষা ও ধ্যান
গণসংস্কৃতি
মানববিরোধী প্রগতি
মঞ্চে বিষাদবাদ
নাস্তিবাদ

তৃতীয় অধ্যায় : শিল্প জগৎ ৩৩
শিল্প ও বিজ্ঞান
শিল্প ও ধর্ম
মানবমুখের রাজত্ব
শিল্পী ও শিল্পকর্ম
শিল্প ও সমালোচনা

চতুর্থ অধ্যায় : নৈতিকতা ৪৫
কর্তব্য ও স্বার্থ
উদ্দেশ্য ও কর্ম
নৈতিকতা ও যুক্তিবুদ্ধি
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক
নৈতিকতা ও ধর্ম

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : সংস্কৃতি ও ইতিহাস ৫৬
প্রারম্ভিক মানবতাবাদ
শিল্প ও ইতিহাস
নীতি ও ইতিহাস
শিল্পী ও অভিজ্ঞতা

ষষ্ঠ অধ্যায় : ড্রামা ও ইউটোপিয়া ৬৫
ব্যক্তিত্ব ও 'সামাজিক ব্যক্তি'
ইউটোপিয়া ও পরিবার

দ্বিতীয় খণ্ড : ইসলাম

সপ্তম অধ্যায় : মুসা (আঃ)—যীশু খ্রিস্ট— মুহাম্মদ (সাঃ) ৭০
'এখানেই এবং এখনই'
বিশুদ্ধ ধর্ম
খ্রিস্টবাদের গ্রহণ ও বর্জন

অষ্টম অধ্যায় : ইসলাম ও ধর্ম ৮১
পঞ্চ স্তম্ভের দ্বৈততা
ধর্মের প্রত্যাবর্তন প্রকৃতিতে
ইসলাম ও জীবন

নবম অধ্যায় : আইনের ইসলামী প্রকৃতি ৯৭
শাস্তি ও সামাজিক প্রতিরোধ

দশম অধ্যায় : ধারণা ও বাস্তবতা ১০১
বিবাহ

একাদশ অধ্যায় : ইসলামবহির্ভূত 'তৃতীয় পন্থা' ১০৩
অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন জগৎ
ঐতিহাসিক সমঝোতা ও সামাজিক গণতন্ত্র

সম্পূর্তি : স্রষ্টার নিকট আত্মনিবেদন ১১৩
পরিশিষ্ট ১১৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

পৃথিবীতে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তি সব সময় দ্বন্দ্বরত। একটি শক্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে ধর্ম, অপরটির ভিত্তিমূলে রয়েছে ধর্মসংযোগহীন বৈজ্ঞানিক জীবনোপলব্ধি। প্রথমোক্ত জীবনবোধের উৎসে রয়েছে স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস, নিজের আত্মিক শক্তির ওপর শ্রদ্ধা, আত্মার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিরন্তন মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা এবং সৃষ্টিকর্তা–প্রদত্ত জীবন নির্দেশনার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি। অপর শক্তিটি যে জীবনোপলব্ধিকে আশ্রয় করে চলে তা কোন চিরন্তনত্ব স্বীকার করে না এবং উপরোক্ত চারটি বিষয়কে অগ্রাহ্য করে; শুধু বুদ্ধিকে সম্বল করে তার যাত্রা। কিন্তু শুধু বুদ্ধিবাদনির্ভর বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত প্রগতিশীলতা যে মানব সভ্যতা ও মানব জীবনকে স্বস্তিকর পথের সন্ধান দিতে সক্ষম নয় ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়েছে। তদুপরি সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞান গবেষণাও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, বুদ্ধির মারফত চিরন্তন সত্য জানা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় ধর্মভিত্তিক শক্তির মূল ধারক হিসেবে স্মরণ করতে হয় চিরন্তন ইসলামকে। ইসলাম উপরোক্ত ধর্মীয় আবহগুলোর সংরক্ষণ ও লালন করার পাশাপাশি বুদ্ধিবাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যয়গুলো গ্রহণ করেছে। ফলত ইসলামের এই সমন্বয়ধর্মী সর্বব্যাপী স্বভাব জগৎ সংসার ও জীবনের তন্ময় ও মন্ময় সকল ক্ষেত্রেই সুপ্রবেশ্য হয়েছে। ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ এই বিষয়গুলো অতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'Islam Between East and West' বইটিতে। পাশাপাশি যেহেতু স্থূল বস্তুবাদ পাশ্চাত্য জগৎকে কুক্ষিগত করেছে এবং যেহেতু ইসলামের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সাথে ইসলামের বিরোধ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, ধর্মবিরোধী শক্তি কিভাবে সেই বিরোধী মনোভাবকে আশ্রয় করে ইসলামী শক্তি ও মননকে ক্ষয় করার চেষ্টা করেছে ড. আলীয়া তাঁর বইয়ে তা উচ্চতর তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাসহ পরিস্ফুট করেছেন। এ সমস্ত কারণে এ বইটি মুসলিম চিন্তাবিদ ও সাধারণ পাঠকের জন্য অবশ্য পঠনীয়।

ইফতেখার ইকবাল বাংলা ভাষায় বইটির চমৎকার তর্জমা করে বাঙালী পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করেছেন। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

সৈয়দ আলী আশরাফ
ভাইস চ্যান্সেলর
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা
মহাপরিচালক
দি ইসলামিক একাডেমী কেম্ব্রীজ

www.pathagar.com

ভূমিকা

বসনীয় সঙ্কট আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সারায়েভোর আইনজীবী ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচের সপ্রতিভ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রচার মাধ্যমে যুদ্ধ ও শান্তি প্রক্রিয়ার নানা খবরের পাশাপাশি তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানও পরিস্ফুট হচ্ছিল। Vance-Owen শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, 'We have the choice between just war and unjust peace'. এদিকে তাঁর দেশবাসী বসনীয় মুসলিমদের প্রসঙ্গে একবার তিনি মন্তব্য করেন, 'We knew that our people were a good people .... When I say a good people, I mean a people who does not respond to the destruction of mosques with the destruction of churches' এখানে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একটি জাতির সংগ্রামী নেতা, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিক হিসেবে তাঁর পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁরই অনন্য সৃজনশীলতা। এখানে তিনি একজন দার্শনিক, শিল্পী, সমাজবিজ্ঞানী, একজন ধীমান সত্যানুসন্ধানী। তাঁর লিখিত 'Islam Between East and West' গ্রন্থটি এই সাক্ষ্য দেয়।

১৯৮৪ সালে 'Islam Between East and West' ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও উপস্থাপনাকৌশল অচিরেই সারা বিশ্বের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। আবহমান মানবেতিহাসের ধারায় যে সমস্ত আদর্শ ও মতবাদ প্রযুক্ত হয়েছে সে সবের আলোকে ইসলামের অবস্থান নির্ণয় করা এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। এ কারণে ইসলামের তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ভেতর থেকে নয়, বরং একজন বহিরাগত দর্শক হিসেবে এবং কোন তত্ত্বীয় মহীরুহ নয়, বরং একটি স্বয়ংসমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থা বা মডেল হিসেবে ইসলামকে দেখেছেন তিনি। তাঁর বিবেচনায় 'বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ থেকে নিঃসৃত ফর্মুলাগুলো কোন কার্যকর সমাধানসূত্র প্রণয়নের আগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কারণ বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বৈপরীত্য .... যেহেতু Man is a complete synthesis, সেহেতু দুটোর কোনটিই মানব প্রকৃতির নিকটবর্তী হতে পারেনি।' ড. আলীয়া এই সূত্র ধরেই জগৎ জীবনের ইসলামী অনুসিদ্ধান্তগুলোর সার্থকতা ও আলোকদীপ্তি তুলে ধরেছেন। ইসলামের মৌল সূত্রগুলো বিশ শতকীয় পাশ্চাত্য মননের নিকট পরিস্ফুত করতে তিনি একাডেমিক ও সৃজনশীল চিন্তাপদ্ধতির যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা বিরল, সম্ভবত অনুপম। সহজেই অনুমেয় যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বীয় অসঙ্গতি এবং বিশ্বব্যাপী সাম্য সাধনে পুঁজিবাদের ব্যর্থতার পর একটি তৃতীয় ধারার বিকল্প হিসেবে ইসলামের পুনরাবির্ভাব প্রক্রিয়া সামনে রেখে ড. আলীয়ার এই গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা সমুন্নত থাকবে দূর ভবিষ্যতেও।

স্নেহভাজন ইফতেখার ইকবাল বেশ কিছুকাল যাবৎ ঢাকার পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ে লিখছেন। 'Islam Between East and West' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী কাজ সম্পন্ন করেছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণধর্মী ও অপেক্ষাকৃত জটিল হলেও তিনি তা বাংলা ভাষায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে এরকম একখানি সারধর্মী গ্রন্থ তুলে দেওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ড. কে. এম. মোহসীন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ও
প্রাক্তন ডীন, কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ধর্মের বিকল্প আছে, মৃত্যু নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিদ্বৎ সমাজের অনেকেই নিরাবেগ ও নির্মোহ থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ সম্ভবত এই প্রচলিত একদেশদর্শিতা এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। এ কারণে তাঁর বই 'Islam Between East and West' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বইটির বিষয়বস্তুর ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

নয় > প্রতিনয় > সমন্বয় (thesis > antithesis > synthesis)—ইসলাম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। এখানে দেখানো হয় যে, বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ 'নয়' ও 'প্রতিনয়' হিসেবে সমন্বয়ের ইসলামী প্রেক্ষিত নির্মাণ করে অর্থাৎ ইসলাম বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মচেতনা আত্মস্থ করে একটি সুসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সনাতনী ব্যাখ্যা কাঠামোতে ড. আলীয়া ভাবনার যে বৈভব যুগিয়েছেন তা অনেক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব এবং সক্রিয় মনোযোগের দাবি রাখে।

মানুষের সকল ভাবনা–চিন্তার মূল বিষয়বস্তু স্বয়ং মানুষ। মানুষের স্বস্তি ও সমস্যা, তার বেদনা ও সুখ, তার নৈরাশ্য ও আশা, তার তন্ময়তা ও মন্ময়তা, তার ক্ষুধা ও বিলাস, তার প্রগতি ও অগতি– সবকিছু নিয়েই রচিত হয়েছে জগৎ জীবনের নানা তত্ত্ব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, মানুষ নামের মহাসমুদ্রের দিকেই সকল চিন্তাস্রোতের অনিবার্য যাত্রা। কাজেই মানুষের তুলনামূলক কল্যাণ ও সুস্থিতির জন্যে প্রদত্ত ফর্মুলাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে মানুষ ও মানবপ্রকৃতিকে এই ফর্মুলাগুলো কতটা ও কিভাবে বুঝেছে –তার ওপর। এ প্রেক্ষাপটে লেখক জগৎ জীবন সম্পর্কিত সকল তত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনার মূলোৎপাদক হিসেবে দেখেছেন বস্তু ও আত্মাকে। কিন্তু লেখকের বিবেচনায় বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ থেকে নিঃসৃত ফর্মুলাগুলো কোন কার্যকর সমাধানসূত্র প্রণয়নের আগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; এর কারণ বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বৈপরীত্য (নয় ও প্রতিনয় সম্পর্ক)। যেহেতু নয় ও প্রতিনয় মিলিয়েই মানুষ, যেহেতু man is a complete synthesis, সেহেতু দুটোর কোনটিই মানব প্রকৃতির নিকটবর্তী হতে পারেনি। বস্তুত মানব প্রকৃতিকে যথার্থে অনুধাবন, অধ্যয়ন ও সেখানে পৌঁছানোর ব্যর্থতাই হল পৃথক পৃথকভাবে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত অক্ষমতা। লেখক প্রদত্ত 'বৈপরীত্যের ছক'টি নিরীক্ষা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এই ছকটি[১] বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, কারণ প্রথমত তা আমাদেরকে সমন্বয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দান করে, দ্বিতীয়ত 'নয়' ও 'প্রতিনয়ে'র মধ্যকার বিরোধ যত বেশি, সমন্বয় তত বেশি জোরালো ও আকর্ষণীয় হয়–এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতও সেখানে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ধর্ম (অধ্যাত্মবাদ)	বস্তুবাদ
– জীবাত্মা	– জড়
– বিবেক	– সত্তা
– আত্মা	– দেহ
– বিষয়ী	– বিষয়
– শুদ্ধসত্তা (কান্ট)	– অবভাসসমূহ
– অস্তিত্বের দ্বারা অস্তিত্ব	– অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব
– জৈবিক	– যান্ত্রিক
– জাতি–প্রতীক	– জাতি–সংখ্যা
– গুণ	– মাত্রা
ধর্ম–শিল্প	**বিজ্ঞান–প্রযুক্তি**
– প্রার্থনা	– উৎপাদন
– প্রার্থনা	– স্বাস্থ্য সচেতনতা–পরিচ্ছন্নতা
– দান	– ট্যাক্স
–চৈতন্য–আদর্শ–ধারণা–পাপ	– প্রয়োজন–স্বার্থ–বাস্তবতা–ক্ষতি
– ধ্যান–অনুপ্রেরণা–স্বজ্ঞা	– পর্যবেক্ষণ–বুদ্ধিমত্তা–অভিজ্ঞতা
– পবিত্র গোপনীয়তা	– পরিচিত সমস্যা
– ড্রামা–নৈতিক প্রশ্নমালা–অধিবিদ্যা	– রাজনৈতিক অর্থনীতি–সামাজিক সমস্যা–পদার্থবিদ্যা
– মঠ–মন্দির–শিল্পগ্যালারী	– স্কুল–ল্যাবরেটরী
– নীতি	– ক্ষমতা
– প্রেম–অহিংসা	– শ্রেণী সংগ্রাম–স্বার্থের কারণে সন্ত্রাস
– সাধু	– বীরযোদ্ধা
– স্টাইল	– ফ্যাশান
– নান্দনিক রূপায়ণ	– প্রযুক্তিগত যথার্থতা
সৃজন	**বিবর্তন**
– মানুষ খোদা কর্তৃক সৃষ্ট	– মানুষ প্রকৃতির উৎপাদন
– মানুষের মানবিকীকরণ (Prologue in Heaven)	– জীবন্ত বস্তু–পশু–মানুষ–অতিমানুষ
– মিকেল্যাঞ্জেলো	– ডারউইন

www.pathagar.com

– নৈতিক দ্রামা– মোক্ষ লাভের সংগ্রাম (Salvation)	– অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম– প্রাকৃতিক নির্বাচন
প্রাণারোপবাদ	**নৈর্ব্যক্তিকতা**
– খ্রিষ্টীয় ব্যক্তিত্ববাদ	– ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
– ইতিহাসের বীরধর্মী ব্যাখ্যা (প্রতিভাবানরাই ইতিহাস তৈরি করে)	– ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (History does not walk on its head)
– আত্মার ক্রমাগত উৎকর্ষ	– উৎপাদন মাধ্যমের ক্রমোন্নতি– শ্রেণীহীন সমাজ
কিয়ামত	**তাপ ও গতির অকর্ম অবস্থা**
– মানুষ ধারণা/আদর্শ দ্বারা পরিচালিত	– মানুষ প্রয়োজন/ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত
– তপস্যা–চিরায়ত দীক্ষা	– প্রশিক্ষণ–শিক্ষা
– ধ্রুপদী শিক্ষা	– প্রযুক্তিগত শিক্ষা
– নিজের ওপর আধিপত্য	– প্রকৃতির ওপর আধিপত্য
– "আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস কর"	– "নতুন আকাঙ্ক্ষা তৈরি কর"
– কৃতকর্ম কর্মকর্তার নিয়ত দ্বারা বিচার্য	– কৃতকর্ম কর্মের ফল দ্বারা বিচার্য
– উপযুক্ত শাস্তির নীতি	– সামাজিক প্রতিরোধের নীতি
সংস্কৃতি	**সভ্যতা**
– মানবতাবাদ	– প্রগতি
– দ্রামা	– ইউটোপিয়া
– ব্যক্তিত্ব	– সামাজিক ব্যক্তি
– সম্প্রদায়	– সামাজিক শ্রেণী
– Civitas Dei	– Civitas Solis
– সাম্য–স্বাধীনতা–সৌভ্রাতৃত্ব	– শ্রেণী সংগ্রাম
– আমেরিকার 'বিল অব রাইটস' ১৭৭৬	– সোভিয়েত ইউনিয়নের 'মজদুর ও শোষিতের অধিকারের ঘোষণা' ১৯১৮
– অবমানিত ও অপমানিত (দস্তয়েভস্কি)	– অত্যাচারিত (মার্কস)
– আদি পাপ, কৌমার্য, যৌনসংযম	– যৌন স্বাধীনতা, যৌন–বিপ্লব
– বিবাহ ঃ অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন হিসেবে	– বিবাহ ঃ চুক্তি হিসেবে

www.pathagar.com

– বয়োজ্যেষ্ঠ নিয়ে গড়ে ওঠা ধর্মীয় কাল্ট (Wisdom)	–যুবক সম্প্রদায় নিয়ে গড়ে ওঠা সভ্যতার কাল্ট (Bio-Potency)
– ঘর, মাতা, পারিবারিক শিক্ষা, তিন প্রজন্মের পরিবার	– কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী, গণশিক্ষা পৃথক বৃদ্ধাবাস
– যীশু	– মুসা
– খ্রিষ্টবাদ	– বস্তুবাদ

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আত্মা ও বস্তুকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও চিন্তাধারা পরস্পর মেরু দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরায়ণের কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকছে না। ফলে মানবপ্রকৃতির খণ্ডিত অবয়বকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠার কারণে কোনটি পূর্ণাঙ্গসত্তা ও চিরন্তন দ্বৈততার (দ্বিপ্রান্তিকতার মিলন/ সমন্বয়/মধ্যপন্থা প্রভৃতি দ্বৈততার সমার্থক শব্দ হিসেবে এসেছে এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে) অনুপম আধার এই মানুষকে বুঝতে, অতঃপর তার জন্যে মসৃণতর ও সহজ জীবন ব্যবস্থাপনা রচনা করতে সক্ষম হয়নি। কারণ মানুষের যে ব্যর্থতা তা হয় জৈব প্রয়োজনের প্রতি ধর্মাশ্রয়ী বিমুখতা থেকে, নয়তো আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি বস্তুবাদী প্রত্যাখ্যান থেকে।

"এখন এমন কোন তৃতীয় ধারার যুক্তি আছে কি যা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির একক সন্নিবেশ ঘটিয়ে অতঃপর এদের থেকে ওপরে স্থান পেতে পারে? হ্যাঁ, একমাত্র জীবন, মানুষের জীবনই, তত্ত্বগতভাবেই হোক আর প্রায়োগিক অর্থেই হোক– এসবের ওপরে স্থান পেতে পারে। সুসমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবন যাপন যে কোন ধর্ম, মতবাদ ও তন্ত্রের উর্ধ্বে।" অতঃপর ড. আলীয়া বলছেন, "আমরা ইসলামের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বীয় দ্বৈরথ সামনে রেখেই বলতে পারি যে, ইসলাম গুরুত্ব দেয় প্রথমত প্রাথমিক দ্বৈতবাদকে বোঝা এবং স্বীকার করে নেওয়া, অতঃপর তা অতিক্রম করে যাওয়ার ওপর। 'ইসলামী'—আমাদের আলোচনায় ব্যবহার্য এই বিশেষণটি শুধু কতকগুলো অনুশাসনের অলঙ্করণের জন্যে নয়, বরং তাদের মধ্যকার মৌলিক চিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ইসলাম একটি রেডিমেড ধর্মীয় আজ্ঞার পরিবর্তে একটি পদ্ধতি ও বিপরীত নীতিসমূহের সমন্বয় হিসেবে গৃহীত যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই কাঠামোকে যার মধ্যে জীবন বিকশিত হয় স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকতায়।"[২]

বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের এই সমন্বয়কে কোন কোন দার্শনিক ভিন্ন উপসংহারে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।[৩] কিন্তু ড. আলীয়ার স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য এইখানে যে, তিনি তাঁর সমন্বয় ভাবনাকে মানুষের সাথেই সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট করতে চান। কারণ তিনি দেখেছেন যে, মানবপ্রকৃতি ও ইসলাম অভিন্ন; নির্দ্বিধায় তিনি বলছেন, "Man is the obvious argument of Islam."

www.pathagar.com

লেখক মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে শিন্নদর্শনের আলোকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন এবং শেষে মুসা (আঃ) ও যীশু খ্রিস্টকে যথাক্রমে বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর ইসলাম এসেছে এক সুসমন্বিত grand narrative হিসেবে। এ পর্যায়ে মনে হতে পারে আলীয়া আলীর বইটি কুরআনের এই ছোট্ট আয়াতের ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ "এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"[৪]

কিন্তু এটাই ইসলামের শেষ কথা নয়। ইসলামের চূড়ান্ত নির্যাস নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে। এ সূত্রে ইসলাম উপরোক্ত সমন্বয়কে আত্তীকরণপূর্বক তাকে অতিক্রম করে যায়। তখন স্মরণ করতে হয় ইব্রাহিম (আঃ)-কে যিনি ইহুদিও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত ও সৃষ্টিকর্তায় নিবেদিত একজন আধুনিক মানুষ ও মুসলিম। হযরত ইবরাহিমের পর কয়েক হাজার বছর ধরে সৃষ্টিকর্তার বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করা হয় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সরল ও স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার দায়িত্ব দিয়ে। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় ঃ "He (Muhammad) shall prepare the way for Me"[৫] এখানে ইসলামের সদাসাম্প্রতিকতা ও সার্বজনীনতার দাবি প্রাসঙ্গিক হয়।

এবারে আমরা বইটি লিখিত হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটের ওপর সামান্য আলোকপাত করতে পারি।

ইসলামের জন্ম থেকে আজ অবধি পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ ইসলামকে ঋণাত্মকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম দিকে ক্রুসেডের সমর্থনে এবং পরবর্তীতে উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিক সমর্থন যোগানোর উদ্দেশ্যে এটা করা হয়। সেক্সপীয়ার ইসলাম সম্পর্কে ইওরোপের মধ্যযুগীয় জ্ঞান অনুসরণে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিবেচনা করেছেন যাদুকর[৬] হিসেবে। আরেকদিকে পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ম্যাক্স ওয়েবার 'আমরা' (উত্তর-পশ্চিম ইওরোপীয়) এবং 'তাদের' (প্রাচ্যবাসী) মধ্যকার পার্থক্যকে বিন্যস্ত করেছেন।[৭] বর্তমানকালে বিশ্বব্যবস্থায় নবতর রূপায়ণ প্রক্রিয়া সামনে রেখে পশ্চিমের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণমাধ্যমে ইসলামকে অস্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।[৮] ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ জন্মসূত্রে একজন ইওরোপীয় হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্বের বিকাশ ও প্রচারণার কৌশল ঘনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষা করেছেন। উপরন্তু ঠিক একই পরিস্থিতি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশেও নির্মিত হয়েছে।

মার্শাল টিটো ১৯৬০ সাল নাগাদ পাঁচ শ' বছর ধরে বসবাসরত অথচ ক্রমাবনত বসনীয় মুসলিমদের সীমিত আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেন। কিন্তু সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা এ প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেনি। তারা যুগোস্লাভিয়ার মাটিতে মুসলিমদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মতৎপরতার বিরোধিতা করে এসেছে। যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীতে মুসলিমদের আনুগত্য

www.pathagar.com

পরীক্ষা করার জন্যে শূকরের মাংস বাধ্যতামূলক করা হয়। সে ক্ষেত্রে হয় তাদেরকে চাকুরি ছাড়তে হত নয়তো ইসলাম ছাড়তে হত। ধারণা করা হয় এ পরিকল্পনা সার্বীয় রাষ্ট্রীয় পরামর্শকদের মাথা থেকে এসেছিল। আশির দশকের শুরুতে যুগোস্লাভিয়ায় মুসলিম ও ইসলামবিরোধী তৎপরতা জোরতালে শুরু হয়। এ পর্যায়ে সার্বীয় সরকার, সামরিক জান্তা, জাতীয়তাবাদী গণমাধ্যম, অর্থডক্স চার্চ, এমন কি সার্বীয় সাম্যবাদীরা জোট বাঁধে এবং তাদেরকে তাত্ত্বিক সমর্থন যুগিয়ে যায় সার্বীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা।[৯] ১৯৯২ সালের এপ্রিলে বসনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যুগোস্লাভ সামরিক জার্নালের পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় সার্বীয় পণ্ডিত 'ইসলাম বিশেষজ্ঞ' ডারকো তানাসকোভিককে বলা হয় 'তাদের' ও 'আমাদের' (যথাক্রমে মুসলিম ও খ্রিষ্টান) মধ্যকার পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে। বসনীয় মুসলিমদের গণহারে হত্যাকে বৈধতা দানের জন্যে এ শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ইসলামকে চিহ্নিত করেছেন স্বৈরতান্ত্রিক, অদ্ভুত, রক্ত পিপাসু, পশ্চিমা সভ্যতায় অবাঞ্ছিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'abnormal' ধর্ম হিসেবে। বসনীয় মুসলিমরা যখন দাবি করে যে, তারাও খাঁটি ইওরোপীয়, তখন সে দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয় 'A notorious absurdity' বলে।[১০] তাদের কেউ কুরআনকে বলছেন, "স্বৈরধর্মী, অসমঝোতামূলক ও ভয়ঙ্কর," আবার কুরবানী প্রসঙ্গে কেউ বলছেন যে, যারা এভাবে অবলীলায় পশু হত্যা করতে পারে তাদের নিকট মানুষ হত্যা কঠিন কিছু নয়। এসব মিলিয়ে আরেকজন সার্বীয় পণ্ডিত বলছেন, "আলীয়া আলী শান্তি চান না (বসনীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে)। কারণ তিনি যদি শান্তির পক্ষে যান, তবে ইসলাম থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েন" (যেহেতু ইসলাম অশান্তি ও সন্ত্রাসের ধর্ম।)[১১]

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সাম্প্রতিককালে চলে এলেও স্মর্তব্য যে, এই আমূল ইসলাম বিরোধিতা চলে আসছে এ অঞ্চলে তুর্কীদের আগমনের পর থেকেই (১৪৬৩)। সম্ভবত তাঁর তাৎক্ষণিক পরিপার্শ্ব থেকে উদ্ভূত এই নেতিবাচক বুদ্ধিবৃত্তি ড. আলীয়াকে মহাদেশীয় ইওরোপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তিনি ইংল্যান্ডকে মহাদেশীয় ইওরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশটিকে প্রয়োগবাদের প্রতিভূরূপে দেখেছেন, যেখানে নয় > প্রতিনয় > সমন্বয় প্রক্রিয়াটি সচল। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, পশ্চিমা সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট, ভয়াবহ নৈতিক লক্ষ্যহীনতা, বিশ্বক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক প্রবণতা ইত্যাদি থেকে এ্যাংলো-স্যাক্সন ইংল্যান্ড (এবং প্রয়োগবাদের সূত্রে আমেরিকা) সরে আসবে 'মধ্যপন্থা'র দিকে। অতঃপর তিনি এই ইংরেজি প্রজ্ঞা ও মননের শেকড় খুঁজেছেন রজার বেকনের লেখায় যিনি আরবীয় চিন্তাচেতনার একজন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, স্নায়ু যুদ্ধের তীব্রতার কালে 'Islam Between East and West' বইটি লিখিত হয়। স্বভাবতই এ সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে অস্বস্তিকর মেরুকৃত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা এই বইয়ের অন্যতম আখ্যান হিসেবে উঠে এসেছে। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিচ্যুতিগুলো নানাভাবে বিবৃত হয়েছে নানা পর্যায়ে। তবে সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করা হয়নি। সমাজতন্ত্রের উত্থান ও বিকাশকে

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিচ্যুতিগুলো নানাভাবে বিবৃত হয়েছে নানা পর্যায়ে। তবে সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করা হয়নি। সমাজতন্ত্রের উত্থান ও বিকাশকে এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক প্রকল্প ও প্রস্তাবনাকে লেখক একটি ব্যাপক ও প্রাচীন দর্শনের অংশ হিসেবে দেখেছেন। এই দর্শনের গভীরে প্রবেশ করেছেন তিনি এবং বাস্তবতার নিরিখে এর অন্তসারশূন্যতার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত হয়েছেন যে, '৭০ এর দশকে লিখিত এই বইয়ে তিনি সমাজতন্ত্রের পতনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বলা বাহুল্য, যে দার্শনিক প্রজ্ঞার জোরে তিনি সমাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য মনে করেছেন, সেই একই প্রজ্ঞার জোরে তিনি ভোগনিষ্ঠ নিখাদ পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অক্ষমতাকেও অকপটে তুলে ধরেছেন।

ফলে এখানে অন্তত দু'টো ব্যাপার স্পষ্ট হয়। প্রথমত, স্নায়ুযুদ্ধের দার্শনিক প্রেক্ষিতটি সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি আলীয়ার মূল বক্তব্য কালোত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তা সম্ভব হয়েছে ইসলামকে একটি বিশ্বজাগতিক স্বতঃসিদ্ধতা হিসেবে ধরার জন্যে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে ইসলামী বিশ্ব যে বিব্রতকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত ছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলাম আজ একক বিকল্প ধারা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্রান্তিলগ্নে। পতনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শেষে ইসলামের এই প্রত্যাবর্তন কি অনিবার্য ছিল?–তারই একটি আগাম সদুত্তর যেন আমাদের আলোচ্য বই 'Islam Between East and West'; তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম, দর্শনের প্রেক্ষাপটে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ এবং রাজনৈতিক–অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার মাধ্যমে এই অনিবার্যতাকে সত্যায়িত করা হয়েছে এই বইয়ে। কাজেই একটি 'বিশ্বজাগতিক সমন্বয়', 'মধ্যপন্থা' তথা 'ইসলাম'–কে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ড. আলীয়া যে কার্যকরী স্রোতধারা প্রযুক্ত করেছেন তা আজকের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা। আলীয়ার বক্তব্য এতটাই গভীর, স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যে, অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা যায়, তাঁর হাত ধরে চলা যায় না। কাজেই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাদের অর্থ হবে পাঠককে ভারাক্রান্ত করা। অনুবাদ করতে গিয়ে তাই অনেক ক্ষেত্রে টিপিক্যাল বঙ্গীয় প্রকাশভঙ্গীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মূল বক্তব্যের আলোকধারা ম্লান করবে না, অথচ বইয়ের কলেবর কিছুটা কমে আসবে– এই বিবেচনায় কয়েকটি নিবন্ধ অনুবাদ করা হয়নি। বলা বাহুল্য, প্রতিশব্দগত কারণে এবং লেখকের ইংরেজি শব্দ চয়নের নান্দনিক গতিবৈচিত্র্য ধরে রাখার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ ও বাক্য সরাসরি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাদটীকায় দেখা যাবে যে, অনেক স্থানে বই ও লেখকের নাম থাকলেও অন্যান্য তথ্য অনুপস্থিত। এর কারণ বইটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার সময়ে লেখককে কারাবরণ করতে হয়।[১২]

আরও দু'টি কথা। ড. আলীয়ার বইয়ের শিরোনাম 'Islam Between East and West', বাংলা অনুবাদের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম'। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, শ্রুতিমধুরতার জন্যে তা করা হয়েছে; বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথেও তা

www.pathagar.com

বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠেনি বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞ পাঠক হয়ত বইটি পড়ে এই ধারণায় উপনীত হতে পারেন যে, প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা আমরা, তোমরা তোমরা' কিংবা রাডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'the twaine shall never meet'-এর মত মননগত বিচ্ছিন্নতাবাদের চর্চায় ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিগন্ত থেকে মুক্ত হয়ে সূর্য যখন ঠিক মধ্যআকাশে, তখনই তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, তখনই সে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিগন্তে সমানভাবে নিজস্ব প্রভা বিস্তার করতে পারে, যদিও তার উত্থান পূর্ব দিগন্তে; ইসলামের অবস্থানও এরকম, যদিও তার উত্থান ঋদ্ধ প্রাচ্যে। আল্লামা ইকবাল এই কথাটি বলতে চেয়েছেন তাঁর 'জাভিদ নামা'র একটি পঙক্তিতে যা ড. আলীয়া তাঁর বইয়ের গোড়াতে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"Though it is from the East that the sun rises,
showing itself bold and bright,
without a veil, it burns and blazes with inward fire
only when it escapes from the shackles of East and West.
Drunk with the splendor it springs up out of its East
that it may subject all horizons to its mastery,
its nature is innocent of both East and West,
though in origin, true, it is an Easterner."

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত ত্রুটিবিচ্যুতি এড়ানো যায়নি। অনুবাদকের জ্ঞানগম্যির সীমাবদ্ধতা, অসংলগ্ন টাইপসেটিং এবং অন্যান্য মুদ্রণবিভ্রাট মননশীল পাঠকের মনে বিরক্তি জাগাতে পারে। আশা করি দুর্বলতাগুলো পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সকলের শুভেচ্ছা ও সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দিতে পারে।

বৈশাখ ১৪০৩
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনীত
ইফতেখার ইকবাল

www.pathagar.com

টীকা

১. বইয়ের শুরুতে লেখক ছকটিকে উপস্থাপন করেছেন। পৃথকভাবে অনুবাদ না করে বর্তমান আলোচনার সাথে তা জুড়ে দেওয়া হল।

২. 'বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. যেমন, গোবিন্দ চন্দ্র দেব এই সমন্বয়ের চারা রোপণ করতে চেয়েছেন স্বজাবাদের জমিনে। দ্রষ্টব্য Hasan Azizul Huq's Introduction to the 'Collected Works of G. C. Dev', Bangla Academy.

৪. ২:১৪৩।

৫. Encyclopaedia of Seerah, vol. 1. Seerah Foundation, London, 1941, P. 142.

৬. দ্রষ্টব্য Henry VI, part 1, (1. ii, 140).

৭. Bryan S. Turner, 'Postmodernism and Islam' শীর্ষক বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে। -Modern Asian Studies, 27, 4/1993, Cambridge P. 897.

৮. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য Edward Said-এর 'Orientalism : Western Concept of the 'Orient', (1978), 'Covering Islam' (1981); Akbar S. Ahmed-এর 'Postmodernism and Islam : Predicament and Promise' (1992); P.K. Hitti-এর 'Islam and the West'; Iftekhar Iqbal-এর 'Media as Knowledge and Continuity of Domination', The New Nation, Dhaka, 23 Nov, 1995.

৯. Norman Cigar, 'Serbia's Orentalists and Islam : Making Genocide Intellectually Respectable,' Islamic Quarterly, London, 3/1994.

১০. প্রকৃতপক্ষে বসনীয় মুসলমানগণ অভিবাসকারী বা বহিরাগত নন। তুর্কীদের অভিযানের সময় Bogomiles নামক সার্বীয়দেরই একটি দলছুট গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে এবং বসনিয়ায় বসবাস করতে থাকে।

Huq-Aziz, The Bosnian Crisis . . . Journal of International Relations, No 2. 1994, Dhaka University.

১১. Norman Cigar, ibid.

১২. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে

জগৎ-ভাবনা পরিক্রমায় তিনটি মাত্র পথ বিবেচ্য ঃ ধর্মীয়, বস্তুবাদী ও ইসলামী।[১] এই তিনটি পথ তিনটি মূলগত সম্ভাব্যতার নির্দেশক- চৈতন্য, প্রকৃতি ও মানুষ বা যথাক্রমে খ্রিষ্টবাদ, বস্তুবাদ ও ইসলামের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রাচীনতম কাল থেকে আজ অবধি প্রচারিত সকল দর্শন ও শিক্ষা—এই তিনটি মৌল ভাবনাবৃত্তের যে কোন একটিতে পড়তে বাধ্য। প্রথম ও দ্বিতীয়টির পরিক্রমণ শুরু হয়েছে যথাক্রমে আত্মা ও বস্তুকে মূল ধরে এবং তৃতীয়টির বিকাশ ঘটেছে একাধারে আত্মা ও বস্তুকে সাথে নিয়ে। যদি শুধু আত্মাই সর্বাত্মক হত, জীবন হয়ে পড়ত নৈতিকতাহীন ও মানবিক অনুভূতিশূন্য। অপরদিকে যদি শুধু বস্তুই সবকিছুর মূল হত তাহলে বস্তুবাদই হত দর্শনের একমাত্র উপসংহার। ইসলাম আত্মা ও বস্তুর স্বাভাবিক ঐক্যের এক নাম, যার সর্বোচ্চ রূপ স্বয়ং মানুষ। মানব জীবন সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন তা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-উভয়ই আত্মগত করে। মানুষের যে ব্যর্থতা তা হয় জৈব প্রয়োজনের প্রতি ধর্মাশ্রয়ী বিমুখতা থেকে, নয়তো আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি বস্তুবাদী প্রত্যাখ্যান থেকে।

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ বলতেন যে, দুটো মাত্র জিনিষ সর্বতোব্যাপ্তঃ মন ও বস্তু, যার মাধ্যমে তাঁরা বুঝতেন দুটো পর্যায়, দুটো শৃংখলা, দুটো জগৎ যা আলাদা উৎপত্তি ও আলাদা প্রকৃতির ধারক এবং যাদের মধ্যে পরস্পরায়নের কোন সম্ভাবনা নেই, এমন কি পৃথিবীর সেরা চিন্তাবিদরাও এই পৃথকায়নের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। বস্তুত মানুষ বলেই আমরা দুটো বাস্তবতার সাথে সহবাস করি। আমরা এদেরকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এদের থেকে পলায়ন করতে পারি না।

এই দুই মৌল দার্শনিক প্রবণতার একটি শুরু হয়েছে প্লেটো থেকে, আর চলেছে মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান চিন্তাবিদসহ আল গাযযালী, ম্যালেনব্রাক, বার্কলে, ডেকার্ত, লাইবনিজ, কাডওয়র্থ, হেগেল, কান্ট, ম্যাক এবং সাম্প্রতিককালের বাগসোঁ-এর মধ্য দিয়ে। অপরটি বিকশিত হয়েছে ক্রমানুসারে টেলেস্স, হেলভেটিয়াস, হলবাক, দিদেরো, স্পেনসার ও মার্কস-এর মাধ্যমে। মানবিক উদ্দেশ্যমালার প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটে এই দুই চিন্তা প্রবিষ্ট হয়েছে দুই পৃথক ধারায়ঃ মানবতাবাদ ও প্রগতি। কিন্তু ধর্ম প্রগতির পথে পা বাড়ায় না এবং প্রগতি বা বিজ্ঞান মানবতার দিকে অগ্রসরমান নয়।

কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম কিংবা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলেও কিছু নেই। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে কিছু না কিছু বিজ্ঞানগত উপাদান নেই। আবার এমন কোন বিজ্ঞানও নেই যা ধর্মবোধকআকাঙ্ক্ষা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। ব্যাপারটি একটি ভাবনা বা প্রবণতার সত্যিকার উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছুটা জটিলতার মধ্যে এনে দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হল এদের পক্ষ থেকে দাবিকৃত চূড়ান্ত ও যৌক্তিক উপসংহার সহযোগে তাদের মৌলিক ফর্ম-এ

www.pathagar.com

পৌঁছানো। সেক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখব, দুটি পদ্ধতিই আন্তরিকভাবে বিন্যস্ত ও যৌক্তিক। কিন্তু সামান্য মনোনিবেশে দেখা যাবে যে, তাদের আপাতমসৃণতার তলদেশ জুড়ে রয়েছে বিশাল খোড়ল যা পূরণ হতে পারে শুধু একে অপরের বিপরীত উপপাদ্যযোগে। উদাহরণস্বরূপ, যখন বস্তুবাদ দাবি করে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার প্রধান আন্দোলক হল বস্তুগত হেতু, তখন তাৎক্ষণিক প্রতিনয়নে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রতিভাত হয়। আমাদের সামনে তখন ইতিহাসের তথাকথিত বীরত্ববাদী ব্যাখ্যার চিত্রটি (যেমন কার্লাইলের) ভেসে ওঠে যেখানে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মূলোৎপাদক ও প্রভাবক হিসেবে দেখানো হয়েছে কতক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বা বীরকে। অন্য কথায় বস্তুবাদীদের মতে "History does not walk on its head" (মার্কস) এবং অন্যদের মতে, সম্পূর্ণ বিপরীতক্রমে, প্রতিভাবানরাই ইতিহাস তৈরি করে।

একই প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য টানা যায় এই বলে যে, খ্রিষ্টীয় ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব, স্বার্থের বিরুদ্ধে আদর্শ, সমরূপতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। "কামনার বীজাণু ধ্বংস কর" – এই ধর্মীয় দাবির বিপরীতে তাই প্রগতিবাদীদের এই স্বাভাবিক ইঙ্গিতঃ " অনবরত সৃষ্টি কর নতুন কামনা।" কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম ও বস্তুবাদ দুটো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যা এককভাবে আত্মসমাহিত ও আত্মবৃত্ত অতিক্রমণে ব্যর্থ এবং বিশ্বসংসারে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি অসম্ভব। এরা যেন দুটো সমুদ্র "যারা একে অপরের ওপর আধিপত্য করতে পারবে না, একে অপরের মধ্যে মিশ্রিত হতে পারবে না"।[২]

এখন এমন কোন তৃতীয় ধারার ব্যবস্থাপনা আছে কি যা এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গির একক সন্নিবেশ ঘটিয়ে, অতঃপর এদের থেকে ওপরে স্থান পেতে পারে? হ্যাঁ, একমাত্র জীবন, মানুষের জীবনই তত্ত্বগতভাবেই হোক আর প্রায়োগিক অর্থেই হোক, এ সবের ওপরে স্থান পেতে পারে, এদেরকে নিয়েই। সুসমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ ও নৈতিক জীবন যাপন যে কোন ধর্ম, মতবাদ কিংবা তন্ত্রের উর্ধ্বে। খ্রিষ্টবাদ যে মুক্তি ভাবনার পরিশোষক তা শুধু অন্তর্মুখী মুক্তি এবং সমাজতন্ত্র যে মুক্তির পথ দেখায় তা শুধু বহির্মুখী মুক্তি। এই অসমাধানযোগ্য পারস্পরিক লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে আমরা বাস্তব কারণেই উভয়টিকে গ্রহণ করার তাড়না অনুভব করি। নচেৎ দুই বিপরীতধর্মী শিক্ষা 'আমাকে' 'সত্য'কে এবং সমস্ত মানুষের ভাগ্যকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছেমত ভাগবাটোয়ারা করে নেবে–এই স্বাভাবিক চিন্তাও আমাদের মধ্যে কাজ করে। অন্য কথায় কিছু অপরিহার্য ব্যাপার রয়েছে যা ব্যক্তিগত দর্শন যা–ই থাক না কেন, প্রত্যেকেই নিজ জীবনের সাথে সংলগ্ন করতে চায়। সহজাত বোধ, সাফল্য বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার উদ্‌গিরণ ঘটে। এগুলো হল পরিবার, সম্পত্তি, নিরাপত্তা, সুখ, নৈতিকতা, সত্যপরায়ণতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীনতা, স্বার্থ, ক্ষমতা, দায়িত্ব ইত্যাদি। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই ব্যাপারগুলো একটি বাস্তব প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতির

www.pathagar.com

সংগঠন করছে এবং তখনই স্মরণ করতে হয় ইসলামকে।

আমরা দেখেছি, কথিত মৌলিক শিক্ষা দুটোর মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব। কিন্তু এখন বলা প্রয়োজন যে, তা শুধু তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মধ্যে গতকাল যে সূত্রে যুদ্ধ হয়েছে তা হয়ত আজ স্বীকৃত এবং কতক মহার্ঘ্য তত্ত্বের অস্তিত্ব রয়েছে শুধু তত্ত্বকেই অলংকৃত করার জন্যে। মার্কসবাদ পরিবার ও রাষ্ট্রের ধারণা প্রত্যাখ্যান করলেও বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সচল রাখে। অপরদিকে প্রতিটি ধর্ম জাগতিক চিন্তা নিয়ে মাথা না ঘামাতে পরামর্শ দিলেও জীবনের সচলতার স্বার্থে ন্যায় ও মঙ্গলময় পৃথিবীর জন্যে সংগ্রামকে মেনে নিয়েছে। মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতার কিছু কিছু মন্ত্র এবং ধর্মকে গ্রহণ করতে হয়েছে গতি বা বলবত্তার সারাৎসার। কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ এককেন্দ্রিক কোন দর্শন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এ প্রেক্ষাপটেই উপরোক্ত দুই চিন্তাপদ্ধতির প্রবক্তাদেরকে নিজেদের অবস্থানে সংহত থেকে (তত্ত্বীয়ভাবে) বাস্তব জীবনে খাপ খাওয়ানোর তাগিদে পরস্পরের নিকট থেকে ধারণা ধার করতে হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্ম যা এক স্থাণু গীর্জায় পরিণত হয়েছিল তা কর্ম সংস্থান, সম্পদ, ক্ষমতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, বিবাহ, আইন, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলে এবং বস্তুবাদ যা রূপ নিয়েছে সাম্যবাদ বা স্বৈরতন্ত্রে তা কথা বলছে মানবতাবাদ, নৈতিকতা, শিক্ষা, ন্যায়, স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে। বিশুদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে এখন আমরা জীবনলগ্ন ব্যাখ্যা উপহার পাচ্ছি উভয় পক্ষ থেকেই। ধর্ম ও বস্তুবাদের এই বিকৃতায়ন ঘটেছে একটি সাধারণ সমস্যা থেকে। সমস্যাটি এই যে, যা শুধু জীবনের খণ্ডাংশকে লালন করে তা কিভাবে জীবনের পূর্ণাঙ্গায়নে অবদান রাখতে পারে!

তত্ত্বগতভাবে যে কেউ খ্রিষ্টান কিংবা বস্তুবাদী হতে পারেন কমবেশি গোঁড়ামিসহ, কিন্তু বাস্তবে কেউই খাঁটি খ্রিষ্টান কিংবা সুসংবদ্ধ বস্তুবাদী হতে পারেন না। চীনা, কোরীয় ও ভিয়েতনামী ইউটোপিয়ার প্রবক্তারা বুনিয়াদী মার্কসবাদী শিক্ষার ধারক বলে কথিত, অথচ তারাই মিশ্রতার বড় উদাহরণ। অর্থনৈতিক ভিত্তির নব রূপায়ণের জন্যে গৃহীত নৈতিকতার লালন করার পরিবর্তে তাঁরা গ্রহণ করেছেন ঐতিহ্যবাহী নৈতিক আদর্শ, বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় বিনয় ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের চর্চাকে। এ সমস্ত দেশে ভাল কাজের পুরস্কারস্বরূপ নৈতিক অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয়। কাজেই গোঁড়া মার্কসবাদী সমাজেও ধর্মীয় অনুষঙ্গ স্পষ্ট। কেননা বিনয়, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা নৈতিক অনুপ্রেরণার মত ব্যাপারগুলো বস্তুবাদী দর্শনযোগে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়।

আমরা ইসলামের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বীয় দ্বৈরথ সামনে রেখেই বলতে পারি যে, ইসলাম গুরুত্ব দেয় প্রথমত প্রাথমিক দ্বৈতবাদকে বোঝা এবং স্বীকার করে নেওয়া, অতঃপর তা অতিক্রম করে যাওয়ার ওপর। 'ইসলামী'– আমাদের আলোচনায় ব্যবহার্য এই বিশেষণটি শুধু কতকগুলো অনুশাসনের অলঙ্করণের জন্যে নয়, বরং তাদের মধ্যকার মৌলিক

www.pathagar.com

চিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ইসলাম একটি রেডিমেড ধর্মীয় আজ্ঞার পরিবর্তে একটি পদ্ধতি ও বিপরীত নীতিসমূহের সমন্বয় হিসেবে গৃহীত যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই কাঠামোকে, যার মধ্যে জীবন বিকশিত হয় স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকতায়।

একটি মধ্যপন্থা গ্রহণে ইওরোপ কখনোই সমর্থ হয়নি। সে কারণে ইওরোপীয় প্রতিশব্দ দিয়ে ইসলামকে অভিব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সালাত, যাকাত, ওযু, জামাহ্ ইত্যাদি পদগুলোকে প্রার্থনা, কর, পরিচ্ছন্নতা, কমিউনিটি ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আবার ইসলাম বস্তুবাদ ও ধর্মের একটি সরলীকৃত সমন্বয়—ঢালাওভাবে এটাও মেনে নেওয়া যায় না, বরং ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য শর্তসাপেক্ষে। ইসলাম এই দুটো শিক্ষার মধ্যবর্তী কোন্ সরল গাণিতিক সমাধান বা তাদের গড় নয়। সালাত, যাকাত, ওযু এগুলো এক অবিভাজ্য ধারণার অন্তর্গত। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের জ্ঞাপক এক একটি পদ এক একটি সার্বভৌম ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে পরিস্ফুট করে তোলে; একই সাথে তা আবার যৌক্তিক দ্বৈত প্রপঞ্চেরও প্রকাশ ঘটায়। এই ব্যবস্থায় মানুষের সমান্তরালতা তাই সুস্পষ্ট। মানুষই এর মাপকাঠি, মানুষই এর ব্যাখ্যা।[৩]

অনেকের নিকট কুরআন অবিন্যস্ত ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সামঞ্জস্যহীন উপস্থাপনা মনে হতে পারে। কিন্তু কুরআন সাহিত্য নয়, কুরআন জীবন। ইসলাম জীবনেরই পথনির্দেশক, তত্ত্বীয় চিন্তার নয়। তাই ইসলামের লিখিত রূপের আপাতঅবিন্যাসের যে ধারণা তার পরিসমাপ্তি ঘটে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর জীবনী সামনে রাখলে। নবীর জীবনই ইসলাম, যেখানে প্রেম ও পৌরুষ, আন্তঃঅনুভূতি ও বাস্তবতা, স্বর্গীয় ও মানবিক ইত্যাদির স্বাভাবিক ঐক্য সাধন হয়েছে। ধর্ম ও বাহ্যনীতির এই 'বিস্ফোরক বিন্যাস' মানুষের জীবনে আনে এক দুর্দমনীয় নৈতিক বলবত্তা। কাজেই ইসলাম জীবনের মৌলবিন্দুর সংরক্ষণ ও লালন করছে।

ইসলামের মধ্যবর্তী অবস্থান আরেক দিক থেকে বোঝা যেতে পারে। ধর্মের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, ইসলাম অতিরিক্ত জাগতিক, অপরদিকে বিজ্ঞানের নিকট তা বিশেষভাবে রহস্যগন্ধী, স্বর্গমুখী। অন্য কথায় বস্তুবাদীরা ইসলামকে দেখেছে ডানপন্থী হিসেবে আর খ্রিস্টানরা দেখেছে শুধু সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলক– তথা বামপন্থী প্রবণতার ধারক হিসেবে। এদিকে ইসলামের অভ্যন্তরেও এই জাতীয় মেরুকরণ দুর্লক্ষ্য নয়। রহস্যবাদী বা সুফীরা সব সময় ইসলামের ধর্মীয় তথা পারমার্থিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন এবং বুদ্ধিবাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক বিপরীত দিকটিকে। কিন্তু উভয় পক্ষই অসুবিধায় পড়েছেন এই কারণে যে, তাদের নির্বাচিত অবকাঠামোর কোনটিতেই ইসলাম প্রবিষ্ট হয় না। আমরা যদি ওযুকে উদাহরণ হিসেবে ধরি তাহলে দেখব যে, রহস্যবাদীরা একে ধর্মীয় পবিত্রকরণের মাধ্যম হিসেবে দেখেন, অপরদিকে বুদ্ধিবাদীরা একে বিবেচনা করেছেন শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার হিসেবে। এখানে দুপক্ষই সঠিক, কিন্তু আংশিকভাবে। অন্যান্য আরও

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ প্রত্যাখ্যান করে রহস্যবাদীরা ইসলামকে একটি ধর্মভিত্তিক উপপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছেন। অপরদিকে বুদ্ধিবাদীরা ইসলামের খাঁটি ধর্মীয় দিককে অবজ্ঞা করে শুধু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে চেয়েছেন যার নাম দেয়া হয়েছে ইসলামী জাতীয়তাবাদ; কিন্তু তা এসেছে নৈতিকতা ও ধর্মের সারাংশবর্জিত হয়ে এবং তা অপরাপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতই সারশূন্য হয়েপড়েছে।

বস্তুত ইসলাম শুধু একটি জাতি নয়, বরং একটি "নৈতিক মিশনের প্লাটফর্ম, যেখানে অন্যায় ও অসত্য প্রত্যাখ্যান করে ন্যায় ও সঠিকের দিকে আহ্বান জানানো হয়।"[৪] আমরা যদি ইসলামের রাজনৈতিক আলেখ্য অশ্রদ্ধা করি এবং ধর্মীয় রহস্যবাদ গ্রহণ করি তাহলে নিঃশব্দে নির্ভরশীলতা ও দাসত্বকে স্বীকার করে নিই। পক্ষান্তরে যদি ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলো উপেক্ষা করি তাহলে নৈতিক শক্তিমত্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি।

যে প্রেক্ষাপটে দু'টি প্রান্তিক বিরোধ সুস্পষ্ট সেই প্রেক্ষাপট ধরেই আমাদের আলোচনা এগুবে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের যে পরিচ্ছন্ন প্রত্যাবর্তন ও স্বাতন্ত্র্য তা কোন দৈবযোগ নয়। এটা ঘটেছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য– উভয় মডেল ও তার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার ঐতিহাসিক তৎপরতা থেকে। ইসলাম আদর্শগতভাবে সার্বভৌম এবং মুসলিম দেশসমূহের এই আদর্শগত সন্নিবেশ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। যখন অন্য সকল ভাবনাকল্প তাদের দূরপ্রান্তিক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মানব জাতির ওপর কার্যকর প্রভাব স্থাপনে অসমর্থ এবং যখন একটি সমন্বয় বা মধ্যপন্থার দিকে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে অগ্রসরমান, তখন আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, ইসলাম এই স্বাভাবিক প্রেক্ষিতকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধারণ ও লালন করে। ইসলাম অতীতে যেমন প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছে তেমনি তাকে আজ আবার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে দুই চিন্তাশিবিরে বিভক্ত জগতে সহজাত একক ভূমিকা গ্রহণ করার দায়িত্ব নিতে হবে।

আমাদের আলোচনা দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে সাধারণভাবে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে ইসলাম তথা ইসলামের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি– দ্বিপ্রান্তিকতা (Bipolarity) নিয়ে। তবে এ বই ধর্মতত্ত্ব নয় এবং লেখকও ধর্মতাত্ত্বিক নন। বর্তমান প্রজন্ম যে ভাষায় কথা বলে এবং যে ভাষায় সব কিছু বোঝে সে ভাষাতেই ইসলামকে ব্যক্ত করা হয়েছে এ বইয়ে অর্থাৎ ইসলামের শাশ্বত রূপ যথার্থেই আছে, এর উপস্থাপনা বা ব্যাখ্যাভঙ্গির আধুনিকায়ন করা হয়েছে মাত্র।

আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ

www.pathagar.com

টীকা

১. ইওরোপে 'religion' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই বইয়ে সে অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবে ইসলাম কোন ধর্মের শ্রেণীকরণে পড়ে না; ইসলাম ধর্মের চেয়েও বেশি কিছু।

২. আল কুরআন ৫৫ঃ১৯–২০।

৩. কুরআনের একটি আয়াত যেন প্রত্যক্ষভাবে এ কথাই বলছে ঃ "তুমি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী থাক, এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি যার ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন —" ৩০ঃ৩০।

৪. আল কুরআন ২২ঃ৪১।

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড ঃ ধর্ম বিষয়ে সাধারণ বিবেচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও বিবর্তন

ডারউইন ও মিকেল্যাঞ্জেলো

জগৎ-জীবন চিন্তার মূলপর্ব জুড়ে রয়েছে মানুষের উৎপত্তির ধারণাটি। মানুষের জীবন যাপন প্রণালী বিষয়ক যে কোন আলোচনাতেও তাই মানুষের উৎপত্তির প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতই বিজ্ঞান ও ধর্মপ্রদত্ত উত্তর পরস্পর বিরোধপূর্ণ।

বিজ্ঞানের ধারণায়, মানুষের উৎপত্তি একটি দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল যার আদিতে পশু ও মানুষের মধ্যে কোন পরিষ্কার পার্থক্য অনুপস্থিত। বিজ্ঞান মানুষকে একটি মানবিক সত্তা হিসেবে স্বীকার করে কতক বস্তুগত ঘটনার প্রেক্ষিতে ঃ সোজা হয়ে হাঁটা, জিনিষপত্র তৈরি করা, স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণ করা ইত্যাদি। এখানে মানুষ প্রকৃতির শিশু এবং প্রকৃতির একটি অংশ হিসেবে গণ্য মাত্র।

বিপরীতভাবে ধর্ম ও শিল্প কথা বলে 'সৃষ্টি' নিয়ে। এখানে এটা কোন প্রক্রিয়া নয়, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছামাত্র; কোন ধারাবাহিকতা নয়, আকস্মিকতা। সকল ধর্ম ও শিল্প পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানকে সম্পর্কিত করেছে তার 'পতনে'র সাথে। সেখানে মানুষ ও শত্রুসুলভ পৃথিবীর মধ্যকার সংঘর্ষকে স্বাভাবিক ধরা হয়েছে।

কিন্তু মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিতর্কে শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় 'মানুষ কে?' সে কি এ পৃথিবীরই অংশ, নাকি এ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু?

বস্তুবাদীদের অবধারণায় মানুষ হল যথার্থ পশু (homme machine)। মানুষ ও অন্যান্য পশুর মধ্যকার পার্থক্য স্তরভিত্তিক, গুণভিত্তিক নয়। ফলত কোন নির্দিষ্ট মানবিক নির্যাস বলেও কিছু নেই।[১] যা রয়েছে তা হল মানুষের 'বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সামাজিক ধারণা। অন্য কথায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস;[২] 'অন্য অনেক কিছুর মত মানুষও প্রকৃতির অপরিহার্য ও সাধারণ নিয়মের অধীন'। মানুষের বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত হয়েছে যা দ্বারা তার নাম 'কাজ'। এঙ্গেলস বলছেন, 'মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা ও কর্মেরই উৎপাদন।' একজন আরও এগিয়ে বলছেন, 'হাত মনস্তাত্ত্বিক জীবনের উৎপত্তি ও উন্নয়ন ঘটায়—হাত ও ভাষার আবিষ্কার পশু জীবনের সমাপ্তি এবং মানবেতিহাসের সূচনার স্মারক।[৪]

এখন উপরোক্ত ধারণাগুলো আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপ্রদ মনে হলেও এটুকু স্পষ্ট যে, তা একই সাথে মানুষের প্রতি এক আমূল অস্বীকারের মন্ত্র পাঠ করে। বস্তুবাদী দর্শনে মানুষ তার বিভিন্ন সংগঠক উপাদানে ব্যবচ্ছেদিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ হিসেবেই অস্তিত্বহীন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে সে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন মানুষ হল সামাজিক সম্পর্কের উৎপাদন। অন্য কথায় বিদ্যমান উৎপাদন মাধ্যমের তথা প্রদত্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের ফল মাত্র।

ডারউইন এই নৈর্ব্যক্তিক মানুষকে তার হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' পদ্ধতিতে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মানুষের কথা বলা, তার ঋজু হয়ে হাঁটা, জিনিষপত্র তৈরি করা ইত্যাদি ব্যাপারকে সম্পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, সবকিছুই 'আদি ফর্মে'র স্মারক যা বস্তুত পদার্থিক–রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এক আণবিক খেলা মাত্র। জীবন, চৈতন্য ও আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, ফলত মানবিক নির্যাস বলেও কিছু নেই।

এখন যদি এই সুবোধ্য কিন্তু নিষ্প্রভ বৈজ্ঞানিক মডেল ত্যাগ করি এবং সিসটিন চ্যাপেলের অভ্যন্তরে পৃথিবীতে মানুষের পতন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কাহিনীসম্বলিত মিকেল্যাঞ্জেলোর বিখ্যাত ছাদচিত্রের দিকে মনোনিবেশ করি তাহলে আমরা এক নতুনতর পুলকের জগতে প্রবেশ করি। যে মহতী থীম এখানে অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে কি কোন সত্য নিহিত আছে? থাকলে, কোন্ সে সত্য?

গ্রীক নাটক, স্বর্গ–নরক সম্পর্কে দান্তের অন্তর্দৃষ্টি, আফ্রিকীয় অতিন্দ্রীয়বাদ, স্বর্গে ফাউস্টের প্রস্তাবনা, মেলানেশিয়ান মুখোশ, প্রাচীন জাপানি দেয়ালচিত্র, আধুনিক চিত্রকর্ম—এ সমস্ত উদাহরণ মোটামুটি একই সাক্ষ্য বহন করে। এটা পরিষ্কার যে, এখানকার মানুষের সাথে ডারউইনের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই এবং কল্পনা করাও অসম্ভব যে, এরা পারিপার্শ্বিকতা ও প্রকৃতির উৎপাদন। 'মুক্তির ধর্ম'–এই আইডিয়ার পেছনে কোন্ অনুভূতি কাজ করে? এই নাটকীয় অভিব্যক্তির অর্থ কি? আর্নেস্ট নীজবাস্তনী তাঁর মানসচক্ষে কি দেখেছিলেন যখন তিনি দান্তের কাব্যের দোযখটি এঁকেছিলেন? মানুষ ও জীবন যদি 'প্রকৃতি মাতার'ই সন্তান হয়, তাহলে অস্তিত্বশীল সকলের মধ্যে এত ভীতি কিসের?

এ সমস্ত প্রশ্ন আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে যে, বিজ্ঞানের অঙ্কিত ছবি আদৌ সুসম্পূর্ণ কিনা। বিজ্ঞান আমাদেরকে পৃথিবীর হুবহু স্থিরচিত্র উপহার দেয়, কিন্তু বাস্তবতার সারবত্তীয় দিকটি উপেক্ষা করে। বিজ্ঞানের যে যৌক্তিক ভিত্তি তা জীবনকে চিহ্নিত করে 'জীবন' ব্যতিরেকে এবং মানুষকে চিহ্নিত করে 'মানবতা' ছাড়া।

জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানের মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়ে ওঠে তখনই যখন জীবনকে পৃথিবীর একটি অংশ অথবা এর উৎপাদন হিসেবে ধরা হয়। অপরদিকে শিল্প তখনই সম্ভব যখন মানুষকে পৃথিবীতে একজন আগন্তুক এবং প্রকৃতি থেকে আলাদা ধরা হয় অর্থাৎ যখন সে ব্যক্তিত্ববাহী হয়। বস্তুত সকল শিল্পই প্রকৃতির সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতার ধারাবাহিক কথন।

সুতরাং মানুষের উৎপত্তির প্রশ্নে বিজ্ঞান ও শিল্প নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত। বিজ্ঞান মানুষের পশুবৎ অবস্থা থেকে মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে ওকালতি করে। শিল্প দারুণ প্রকৌশল সহকারে

www.pathagar.com

দেখায় মানুষ এসেছে অজানা কোন উৎস থেকে। বিজ্ঞান নির্দেশ দেয় ডারউইনকে এবং তাঁর বিখ্যাত সংশ্লেষণে, শিল্প ইঙ্গিত করে মিকেল্যাঞ্জেলো ও সিসটিন চ্যাপেলে উপস্থাপিত তাঁর চমৎকারসৃষ্টিশীলতায়।[৫]

ডারউইন ও মিকেল্যাঞ্জেলো মানুষ সম্পর্কে দুটো ভিন্ন ধারণার উদ্‌গাতা। দুটোর কোনটিই একে অপরের ওপর আধিপত্য করতে পারে না। কারণ একটি সমর্থিত হচ্ছে অসংখ্য অকাট্য তথ্য দ্বারা, অপরটির সমর্থন যোগায় অগুণিত মানুষের হৃদয়–উৎসারিত বিশ্বাস এবং এই দুই পরস্পরবিরোধী সত্য একমাত্র মানুষেই আবর্তিত হতে পারে। শুধু এ দুটোর একীভূত রূপই মানুষকে দিতে পারে তার সম্পূর্ণ ও সত্যিকার ধারণাচিত্রটি।

মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব আছে–এরকম বক্তব্য ডারউইন কিংবা ডি ল্যামার্কের পূর্বেই এসেছে ধর্ম থেকে। কিন্তু ধর্মের দাবি অনুযায়ী পশুত্ব মানুষের একটি দিক মাত্র, অপরদিকে বিজ্ঞানের মতে মানুষ বুদ্ধিমান পশু ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে human শব্দটির ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। শব্দটির দুটো অর্থ রয়েছে। যেমন 'we are human' বলতে বোঝায় আমরা দুর্বল ও পাপী এবং যখন আমরা বলি, 'Let us be human' তখন এটা এমন একটি আবেদন হিসেবে উচ্চারিত হয় যা আমাদেরকে উচ্চমার্গীয় ভালত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার বাধ্যবাধকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিকে যীশু খ্রিষ্ট, যিনি স্বর্গকে সর্বস্ব ভেবেছেন, সেন্ট পিটারকে তিরস্কার করছেন ঃ 'You think only of human' এই কথা বলে।

বস্তুবাদীরা সব সময় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করান সার্বিক বাহ্যিকতার দিকে। এঙ্গেলস বলছেন, 'হাত শুধু কাজকর্মের সহায়কই নয়, তা কাজের একটি উৎপাদনও বটে। শুধু কাজের মাধ্যমেই মানুষের হাত ঐ উচ্চতর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে যার সাহায্যে সে তৈরি করে রাফায়েলের চিত্রকর্ম, থরবাডসেসিনের মূর্তি ও পাগানিনির সঙ্গীত।'[৬]

এখানে এঙ্গেলস যা বলছেন তা বায়োলজিক্যাল ক্রমধারা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, রাফায়েল তাঁর চিত্রকর্ম তৈরি করেছেন তাঁর হাত দিয়ে শুধু নয়, বরং তাঁর অন্তর্গত ভাবগতি দিয়ে। বেতোফেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরব্যঞ্জনা রচনা করেন তাঁর বধিরতাকালে। বস্তুত বায়োলজিক্যাল ক্রমধারা কখনোই আমাদেরকে রাফায়েলের চিত্রকর্ম কিংবা প্রাগৈতিহাসিক গুহা চিত্র উপহার দিতে সক্ষম নয়।

একটি শিল্পকর্ম কিংবা একটি কবিতা যেমন শুধু রঙের পরিমাণ বা শব্দ সংযোজনা দ্বারা বিচার্য হতে পারে না, তেমনি মানবিক সত্তা শুধু কতক বায়োলজিক্যাল ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি হতে পারে না। সত্য যে, একটি মসজিদ তৈরি হয় প্রদত্ত লৌহ কাঠামো, ইট, সুরকি, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু এটাই মসজিদ সম্পর্কে শেষ কথা নয়। এটাই যদি শেষ কথা

www.pathagar.com

হত তাহলে একটি মসজিদ ও একটি সামরিক স্থাপনার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। আবার গ্যেটের একটি কবিতার অন্তস্থিত ভাবসত্যের ধারে কাছে না গিয়েও তার ব্যাকরণ–প্রকরণগত বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটি একই ভাষার একটি কবিতা থেকে একটি অভিধানকে গুরুত্ব দেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একটি অভিধান যথার্থ কিন্তু বোধহীন, অন্যদিকে একটি কবিতার ভিন্নতর অর্থব্যঞ্জনা ও অনধিগম্য নির্যাস রয়েছে। জীবাশ্ম, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব বিবরণ দেয় শুধু মানুষের বাহ্যিক, যান্ত্রিক ও অর্থহীন দিকটিকে। কিন্তু মানুষ একটি সুসম্পন্ন চিত্রকর্ম, মসজিদ কিংবা কবিতার মত; এখানে কি পরিমাণ মালমশলা ব্যবহৃত হল সেটা খুব জরুরি নয়। বস্তুত পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান একত্র মিলে যা, মানুষ তার চেয়েও বেশি কিছু।

মৌলিক আদর্শবাদ

বিবর্তনবাদ অনুসারে সবচেয়ে আদিম মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল সবচেয়ে উন্নত প্রকৃতির পশু। কিন্তু আমরা যদি আদিম মানুষকে কোন আপাতউন্নত পশুর সাথে তুলনা করি তাহলে সেখানে একটি অপরিহার্য পার্থক্য লক্ষ্য করব। একদিকে দেখছি একদঙ্গল পশু খাদ্য অন্বেষণ ও টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত, অপরদিকে আদিম মানুষেরা কোন এক অলৌকিক ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং তার অদ্ভুত সংস্কার, বিশ্বাস কিংবা অবোধগম্য প্রতীক ও রহস্যে নিমগ্ন। পশুর সাথে আদিম মানুষের এই পার্থক্যটি কোনক্রমেই স্তরভিত্তিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আমরা যখন বলি, 'মানুষ বিবর্তিত' তখন তার বাহ্য ইতিহাসচিত্রটি ভেসে ওঠে। কিন্তু যখন বলি 'মানুষ সৃষ্ট জীব', তৎক্ষণাৎ এটা পরিষ্কার হয় যে, সে পশু নয়, উপরন্তু জীবনের অর্থ ও মূল্য নিহিত আছে তার ভেতরকার অস্তিত্বশীল পশুপ্রবৃত্তিকে অস্বীকার ও নিবৃত্ত করার মধ্যে। মানুষ যদি প্রকৃতির শিশুই হত তবে সে কেন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে?

একটি পশুর অস্তিত্বের মূলনীতি হল উপযোগ ও দক্ষতা। বস্তুত পশুপ্রবৃত্তি নিপুণতা ও উপযোগিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কথাটি সুপ্রযোজ্য নয়।

পশুদের সময়বোধ মানুষের চেয়েও প্রখর। উদাহরণস্বরূপ, স্টার্লিং পাখি সূর্যাস্তের ঠিক এক ঘন্টা আগে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে। মৌমাছি তাদের দিনব্যাপী কার্যক্রম বিন্যস্ত করে আশ্চর্যরকম নিখুঁতভাবে। অধিকাংশ ফুল তাদের মধুমকরন্দ বিতরণ করে প্রত্যহ অল্প সময়ের জন্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে। মজার ব্যাপার হল, মৌমাছিদের কাছে এসব খবর অজানা নয়; তারা সঠিক সময়ে সঠিক স্থান থেকে তাদের প্রয়োজনটি পূরণ করে নেয়। আবার ঘরে ফেরার দিকনির্দেশনার জন্যে মাটিতে বিভিন্ন চিহ্নের প্রয়োগ এবং সূর্যের অবস্থানকে পর্বে পর্বে চিহ্নিত করে রাখে তারা। আবার মেঘলা দিনের জন্যে অন্য প্রযুক্তি রয়েছে তাদের। এ সমস্ত সুনিপুণ সামর্থ্যই প্রকৃতিতে প্রজাতিদের টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। বিপরীতক্রমে কতক

www.pathagar.com

নৈতিক নীতিমালা আদিম ও সভ্য উভয় সমাজেই মানুষের পূর্ণ নৈপুণ্যকে হ্রাস করেছে। দুটি সমান বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রজাতির একটিতে যদি নীতিবোধ প্রবিষ্ট করানো হয় তাহলে সেই প্রজাতি শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে পা বাড়ায়। (সৌভাগ্যবশত মানুষ তার দুর্বলতা পুষিয়ে নিয়েছে নৈতিকতার সাথে উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামর্থ্যের সংযোগে।)

মানুষকে অনুকরণ করা ছাড়াও পশুদের মধ্যে এমন কতক গুণ আছে যাকে বুদ্ধিমত্তা হিসেবে স্বীকার করতেই হয়। যেমন, কোন অনতিসূক্ষ্ম হাতিয়ার তৈরি করা কিংবা মানুষের তৈরী জিনিষপত্র ব্যবহার করা। কলা খাওয়ার জন্যে একটি শিম্পাঞ্জির লাঠি ব্যবহার কিংবা একটি ভালুকের পাথর ব্যবহার কিংবা মূকাভিনয় ও কথাবার্তার মাধ্যমে কিভাবে মৌমাছি, হাঁস ও বানরেরা তথ্য আদান প্রদান করে, তার একটি পর্যবেক্ষণচিত্র উপহার দিয়েছেন নিউ ইয়র্ক চিড়িয়াখানার পরিচালক ড· ব্রের।[৭] তাঁর সার্বিক উপসংহার ছিল এই যে, সকল পশুই চিন্তা করতে সক্ষম।

ভাষাও প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যাগত দিকটির সাথে সম্পর্কিত, মানুষের আধ্যাত্মিকতার সাথে নয়। আমরা পশুদের মধ্যে ভাষার প্রাথমিক রূপ লক্ষ্য করি। ভাষাতত্ত্ব, যা শিল্পের বিপরীত, বৈজ্ঞানিকভাবে, এমন কি যৌক্তিক গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হতে পারে। ভাষাতত্ত্ব তাই একটি বিজ্ঞানভিত্তি অর্জন করেছে।[৮] বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি বুদ্ধিমত্তা ও ভাষার মধ্যেও সম্পর্ক বিদ্যমান। বুদ্ধিমত্তা ও বস্তু 'পরস্পরকে সৃষ্টি'র ব্যাপারে যেমন সাহায্য করেছে, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। বার্গসোঁ বলছেন, 'ভাষা মস্তিষ্কের' হাত এবং 'মস্তিষ্কের কাজ হল আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে হ্রাস করা'। মোটের ওপর, মানুষের মধ্যে এমন কিছু নেই যা পশুদের মধ্যেও নেই, এমন কি পোকামাকড় ও নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা, যোগাযোগের মাধ্যম এবং ক্ষেত্রবিশেষে কতক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা পশুদের সাথে মানুষের আত্মীয়তাকেই স্পষ্ট করে তোলে।[৯] কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই বিবর্তনবাদীরা ক্ষান্ত দেন। অন্য যে অসংখ্য ব্যাপারে মানুষের সাথে পশুদের ন্যূনতম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না সে ব্যাপারে তারা নিচুপ। ধর্ম, যাদু, নাটক, শিল্প, নৈতিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি আদিম মানুষকে যেমন, তেমনি আজকের মানুষকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে পশুদের সাথে মানুষের সম্পর্কের তুলনামূলক ব্যাখ্যা কেউ দেননি। পশুদের ক্ষেত্রে বিবর্তন মনে হতে পারে যৌক্তিক, ধারাবাহিক ও সহজবোধ্য। কিন্তু বিচিত্র মনোজাগতিক ধারণাসমূহের ধারক আদিম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে রকম নয়। একটি পশু যখন শিকারে যায় তখন সে যুক্তিসঙ্গতভাবে ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজটি সম্পন্ন করে। কোন পশুই শিকার ধরার সুযোগটি নষ্ট করে না। কুসংস্কার বা এ জাতীয় কোন

www.pathagar.com

কিছুই তাদের কাজকে বাধাগ্রস্ত করে না। আবার বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মেই কোন অক্ষম মৌমাছিকে নিষ্ঠুরভাবে দল থেকে বিতাড়ন করা হয়। নিশ্চয়ই মৌমাছিরা সুশৃংখল সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; কিন্তু এখানে যে জিনিষটির অভাব তা হল আমাদের ভাষায় যাকে বলি, 'মানবতা'।

পশুদের নিকট বস্তুর আপাতবাহ্য রূপই সবকিছু। কিন্তু মানুষের নিকট বস্তুর একটি কাল্পনিক অর্থ রয়েছে–যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। পশুর বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রামের বিষয়টি সুবোধগম্য। কিন্তু আদিম মানুষের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? শিকারে যাবার আগে আদিম শিকারী এবং তাদের পরিবার বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা, প্রার্থনা, বিশেষ নৃত্য, উপোস ইত্যাদিতে নিমগ্ন হতো। সেই সাথে কিছু স্বপ্ন ও ব্যঞ্জনা পরিব্যাপ্ত ছিল তাদের অন্তরে। তারা বিশ্বাস করত, এই নিয়মগুলো না পালন করলে তাদের শিকারযাত্রা সফল হবে না। আর তাদের স্ত্রীরা স্বীয় জীবনসঙ্গীর মৃত্যু আশংকা করত।[১০]

বস্তুত পশুর মত আদিম মানুষও দারুণ শিকারী ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে সে ছিল বিভিন্ন ধর্মাচারণ, মীথ, কুসংস্কার, নৃত্য ও প্রতিমূর্তির স্রষ্টা। সে সব সময়ই অন্য এক জগতের সন্ধানে থেকেছে, মূর্ত কিংবা কাল্পনিক। পশুদের সাথে এখানে মানুষের যে পার্থক্য তা বিবর্তনমূলক স্তর বিন্যাসের নয়, পার্থক্যটি নির্যাসের (Essence)।

মানব সমাজের উন্নয়নের আদিপর্বের সাথে বীজ বপন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত; কিন্তু ব্যাপারটি সম্পর্কিত ছিল মানব উৎসর্গের সাথে। এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর Short History of the World বইয়ে লেখেন, "স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা ছিল শিশুসুলভ, স্বাপ্নিক ও পুরাণপ্রণেতা আদিম মানুষের মনের খোরাক; কোন যৌক্তিক পদ্ধতি তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগেকার পৃথিবীতে যখন নবপোলীয় মানুষের নিকট বীজ বপনের সময় আসত, তখন নরবলি অপরিহার্য ছিল। এটা যেনতেন উৎসর্গ ছিল না। একজন যুবক কিংবা যুবতী নির্বাচনের পর তাকে উচ্চতর সম্মান, ভক্তি, এমন কি পূজো করা হত, অতঃপর তার উৎসর্গ সম্পন্ন হত।"[১১] লেখক আরও বলছেন, "মেক্সিকীয় (অ্যাজটেক) সভ্যতা এক রক্তস্নাত সভ্যতা যেখানে প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষ বলির শিকার হত।" জি, ফ্লাওবার্ট তাঁর Salambo বইয়ে বর্ণনা করেছেন কিভাবে কার্থেজিয়ানরা বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করতে গিয়ে তাদের দেবতা মোলক–এর অগ্নিময় মুখগহ্বরে তাদের শিশুদের ছুঁড়ে দিত। এই সমস্ত কার্যকলাপ পশু কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য নয়। এটা মানবিক কার্যকলাপ যার ব্যাখ্যা হতে পারে মানুষের আবহমান যন্ত্রণার প্রেক্ষিতে (যার পুনরাবৃত্তি আজও দেখছি, যেখানে কতক জাতি এবং কিছু ব্যক্তি অযৌক্তিক কাজ করে চলেছে; যারা পরিচালিত প্রেরণাদীপ্ত সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা নয়, বরং আরোপিত সংস্কার ও ভ্রান্তি দ্বারা)।

www.pathagar.com

কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল ধর্মে উৎসর্গের ব্যাপারটি অস্তিত্বশীল থেকেছে।

উৎসর্গের বিচিত্র ঘটনাক্রম ব্যাখ্যাহীন থেকে গেলেও তা যে অন্যতর শৃংখলা ও অন্য জগতের ঘটনানুষঙ্গী এবং জীবতাত্ত্বিক কাল ও মানবিক কালের মধ্যকার সীমারেখাকে দর্শনীয়ভাবে বুঝিয়ে দেয়–সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা এমন এক নীতির আবির্ভাবকে নির্দেশ করে যা স্বার্থ, মুনাফা ও চাহিদার নীতির সাথে বিরোধপূর্ণ। স্বার্থ জীবতত্ত্বীয়, উৎসর্গ মানবিক। মুনাফা রাজনীতি ও অর্থনীতির এক মৌলিক ধারণা, উৎসর্গ হল ধর্ম ও নীতিবিদ্যার অন্যতম মৌলনীতি।

আমরা আদিম মানুষের নানাবিধ মনোজটিলতা বা বিকৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি; সেক্ষেত্রে দৃশ্যত পশুদেরকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। কারণ পশুদের মধ্যে এ ধরনের কোন জটিলতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু সত্যি কথা হল, এই জটিলতা সেই আবহের প্রকাশ যা নমুনাগতভাবেই মানবিক এবং সকল ধর্ম, কবিতা ও শিল্পের উৎস। এখান থেকে আমরা সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, পশুদের বিবর্তনী ঊর্ধ্বায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধাপগুলো অনুকূলে ছিল; কিন্তু আকাশের দিকে বিস্ময়াভিভূত হয়ে দৃকপাতরত ও নৈতিক বিধিনিষেধে আবদ্ধ মানুষ প্রকৃতির নিকট পদদলিত হবার সকল অনুষঙ্গ নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে এবং মানবেতিহাসের উষালগ্নে প্রতীয়মান হওয়া মানুষের চেয়ে পশুদের এই আপাতশ্রেষ্ঠত্ব পুনরাবৃত্ত হচ্ছে প্রগতির খাতিরে এবং আদর্শবাদকে ধ্বংস করার জন্যে।

বলা হয়ে থাকে, পশুজগৎ থেকে মানুষে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় বাহ্য পার্থক্যগুলো (যেমন ঋজু হয়ে হাঁটা, হাতের উন্নয়ন, কথন, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি) খুব ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এটা পরিষ্কার নয় যে, যে প্রাণীটি খাদ্য সংগ্রহের জন্যে হাতকে প্রলম্বিত করেছে এবং সঙ্গীদের সাথে যোগাযোগের জন্যে শব্দ উচ্চারণ করেছে, সে মানুষসদৃশ না কি বানরসদৃশ! এখানে যে কোন প্রকারের ধর্মবিশ্বাস সন্দেহটিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, পশুরা ধর্মাচরণ, প্রার্থনা ইত্যাদি করতে 'মানবিক' হয়ে ওঠার জন্যে 'অপেক্ষা' করেছে? আসলে বিবর্তনবাদী কথকতায় যতই আকর্ষণ থাক না কেন, মানুষ ও পশুর মধ্যকার যে পার্থক্য তা শারীরিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, তা সর্বোপরি আধ্যাত্মিক পার্থক্য যা অভিব্যক্ত হচ্ছে আমাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক চেতনার মধ্যে। ঋজু হয়ে হাঁটতে শেখা, হাতের উৎকর্ষ, প্রকাশভঙ্গি, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদিতে এই প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধান অসম্ভব। নির্মম হলেও সত্য যে সকল আদিম মানুষ ১৫০০০ বছর আগে ফুল ও জন্তুদের দিকে তাকিয়ে থাকতে আনন্দবোধ করত এবং তাদের ছবি দেয়ালে এঁকে রাখত তারা আজকের সিমেন্ট কংক্রিটের খাঁচায় দিনাতিপাতরত এবং ন্যূনতম সৌন্দর্যবোধহীন ভোগবাদী নগরবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক।

www.pathagar.com

মানুষ পৃথিবীতে প্রকৃতির শিশু হিসেবে আচরণ করে না; এখানে তার আচরণ আগন্তুকের মত। তার মৌলিক অনুভূতি হল ভয় কিন্তু তা পশুদের বায়োলজিক্যাল ভয় নয়। এ ভয় আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজাগতিক যা মানব অস্তিত্বের রহস্যের সাথে সম্পর্কিত। হেইডেগার একে বলছেন "eternal and timeless determinant of human existence"। এটা সেই ভয় যা সম্ভবত আমাদের সকল সংস্কৃতি ও শিল্পের মধ্যে সংক্রমিত।

আদিম মানুষের এই প্রেক্ষিত বর্তমান যুগেও অস্তিত্বশীল বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, শুদ্ধাশুদ্ধি, মহিমময়তা ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাখ্যা যোগাতে পারে। আমরা যদি এই পৃথিবীরই সন্তান হতাম তাহলে কোন কিছুকে আমাদের নিকট পবিত্র বা অপবিত্র মনে হত না। এই ধারণাগুলো আমাদের জ্ঞাত জগতের সাথে খাপ খায় না, তা অন্যতর উৎপত্তির দিকনির্দেশনা দেয় যার কোন স্মৃতি আমাদের কাছে নেই। পৃথিবীর প্রতি ধর্ম ও শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত আমাদের যে প্রতিক্রিয়া তা মানুষের বিজ্ঞানসূত্রীয় পরিচয়কে অস্বীকার করে। মানুষ কেন ধর্মের মধ্য দিয়ে সব সময় তার ভীতি ও নৈরাশ্যকে প্রকাশ করেছে? কেন এবং কোথা থেকে সে মুক্তি অন্বেষণ করে? এমন কোন পশুর অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে ধর্মাচরণ বা বিধি-নিষেধ বর্তমান। কিন্তু যেখানেই মানুষের উপস্থিতি ঘটেছে, ধর্ম ও শিল্প তাকে অনুসরণ করেছে। মানুষের ধর্ম ও শিল্প সব সময়ই একত্রে বন্ধনকৃত। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রভূত গবেষণায় এ ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি। এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে হয়ত অনেক নিষ্পত্তিকর সদুত্তর পাওয়া যেত।[১২]

বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মানুষের ইতিহাস হল ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমাগত বিকাশের ইতিহাস।[১৩] কিন্তু কেউ ব্যাখ্যা করেন নি কেন আদিম মানুষের জীবন ধর্মাচরণ, রহস্য, নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিচিত্র বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। কেন সে তার পরিপার্শ্বের সমস্ত জিনিষের ওপর (যেমন পাথর, তারকা, নদী ইত্যাদি) জীবন ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করল?[১৪] কেন আধুনিকতম মানুষ সব কিছু ঝেড়ে ফেলে যথেষ্ট যান্ত্রিক হয়েও আদিম মানুষের দুঃস্বপ্নকে অতিক্রম করতে পারছে না?[১৫]

মানুষের আবির্ভাবের আগে তথাকথিত প্রাণীজগতের যুগে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না যা ধর্মাচরণ ও আদিম মানবিক নীতি সংক্রান্ত কোন চিত্রের আগাম ইঙ্গিত দেয়। এমন কি আমরা যদি কল্পনা করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে এই কালকে দীর্ঘ করি তবু ধর্মাচরণ বা বিধি-নিষেধের (taboo) চিত্রটি অদৃশ্য থাকে। পশুরা কখনো শারীরিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশুদ্ধি এবং সেখান থেকে অতিবুদ্ধি, অতিপশু (superanimal) তথা নীটশের অতিমানবের দিকে এগোয় না।[১৬] যুয়োলজিক্যাল ও বাহ্যপ্রকৃতিনির্ভর বিবর্তনবাদকে টানা হয়েছে মানুষের মৌল প্রকৃতিকে অনেক দূরে রেখে। দৃশ্যত এই বিবর্তনধারা সরল ও যৌক্তিক, কারণ তা শুধু প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ; ফলত অতিপশুর ধারণাটিও জীবনের অন্তর্মন্থন, মানবিকতা, নাটকীয়তা ও

www.pathagar.com

হৃদয়াবেগবিবর্জিত হয়ে পড়ে। এটা হল হোমানকিউল (Homuncule) যা ফাউস্ট সৃষ্টি করেছে তার টেস্টটিউবে।[১৭] ঠিক সেভাবেই যেন প্রকৃতির টেস্টটিউবে তৈরি হয়েছে মানুষ। কিন্তু সোভিয়েত কবি ভজনেসেনেস্কি এই ধারণার অসারত্ব দেখিয়েছেন এই বলে যে, মানুষ বর্তমানে যা করছে তত্ত্বীয়ভাবে তার সবকিছুই করতে পারবে ভবিষ্যতের কম্পিউটর, শুধু দুটো জিনিষ ব্যতীতঃ ধার্মিক হতে ও কবিতা লিখতে।

পশুদের মধ্যে পবিত্রতা বা শুভাশুভের ধারণা যেমন নেই, তেমনি নেই সৌন্দর্যচেতনা। বানর ছবি আঁকতে পারে—কতক বৈজ্ঞানিকের দেয়া এই মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[১৮] বানর যা পারে তা শুধু মানুষকে অনুকরণ। তথাকথিত বানরশিল্পের কোন অস্তিত্ব নেই। বিপরীতভাবে ক্রোমাগনন যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী গুহামানবদের মধ্যে ছবি আঁকা এবং খোদাই করার যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের সাথে পশুর বৈসাদৃশ্য আরেকটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কোন পশু তার পশু ভাগ্যের জন্যে বিদ্রোহ করে না। বিদ্রোহ মূলত মানবিক আচরণ, মানুষই বিদ্রোহ করেঃ "The only animal who refused to be so."[১৯]

যোহান হুইজিংগা আবিষ্কার করেছেন আরেকটি ক্ষেত্র ঃ খেলাধূলা।[২০] পশুরা খেলে, কিন্তু তার পেছনে কাজ করে বায়োলজিক্যাল প্রয়োজন, যেমন যৌনক্রীড়া। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে খেলাধূলার একটি অন্যতর চিত্র এসেছে। সকল আদিম সংস্কৃতিতে বহুল প্রচলিত একটি খেলার নাম 'পটলাচ'। প্রকৃতিগতভাবে এই খেলা অমিতাচারী, অযৌক্তিক ও উপযোগহীন। হুইজিংগা কাওয়াকিউটাল উপজাতিদের মধ্যে এই খেলার একটি টিপিক্যাল ফর্ম খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে দুই গোষ্ঠী প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরস্পরের মধ্যে জিনিষপত্র দান করত। এই দানের ভাবনাটি তাদের সমগ্র জীবনকে আপ্লুত করে এবং তার প্রভাব পড়ে তাদের শিল্পে, তাদের ধর্মাচরণ ও সাধারণ আইনে। আরেক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, জয়ী হওয়াটা শুধু সাধারণ জিনিষপত্র দানের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হয় না, বরং তা নির্ধারিত হয় নিজেদের জিনিষ নিজেরাই ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে। তারা প্রমাণ করতে চায় যে, এ সমস্ত জিনিষ ছাড়াও বেঁচে থাকা সম্ভব। যদি কোন গোত্রের গোত্রপতি একটি তামার পাত্র ভেঙে ফেলে, কোন তৈজসপত্রে আগুন লাগায় কিংবা তার হাতের লাঠিটি নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার প্রতিপক্ষকে এর চেয়ে বেশি না হলেও অন্তত সমমানের জিনিষপত্র ধ্বংস করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় নিজের জিনিষ নিজে নষ্ট করার এই অদ্ভুত খেলা গোটা আদিম বিশ্বজুড়েই দেখা গেছে। মার্সেল মস তাঁর Essai sur le Don বইয়ে প্রমাণ করেছেন যে, একই প্রথা প্রাচীন মালয়ী, গ্রীক, রোমান ও ওল্ড জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত গ্রানেট চীনা সংস্কৃতিতেও এরকম প্রতিযোগিতামূলক দান ও আত্মসম্পদ ধ্বংসকারী প্রথার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। পটলাচের

www.pathagar.com

প্রচলন ছিল প্রাক–ইসলামী আরবেও, 'মুয়াককারা' নামে। এদিকে মস মত দিয়েছেন যে, ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' পটলাচের একটি বিশাল ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়।

এক সময় ডারউইনের মতবাদকে ধারণা করা হত মানুষের উৎপত্তির চূড়ান্ত ব্যাখ্যারূপে, ঠিক যেমন নিউটনের বিশ্বজাগতিক তত্ত্বকে বিবেচনা করা হত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যারূপে। কিন্তু বিশ্বজগতের কতক নির্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যাখ্যা দানের অক্ষমতার কারণে নিউটনের যান্ত্রিক ধারণা যেমন বিতর্কিত হয়েছে, তেমনি ডারউইনের তত্ত্বটিও পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ। ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব আদিম কিংবা আধুনিক, কোন প্রেক্ষাপটেই মানুষের ধর্মীয় আবহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ মানুষেরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অতৃপ্ত? কেন জীবনযাত্রা ও সাধারণ শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে আত্মহত্যা প্রবণতা এবং মানসিক ব্যাধি বেড়েই চলেছে? কেন প্রগতি অর্থে মানবিকীকরণ বোঝায়না?

মানুষের মন ডারউইন ও নিউটনের সাজানো গোছানো ভাবনাগুলো সহজে প্রত্যাখ্যান করতে চায় না। নিউটনের পৃথিবী সুস্থিত, যৌক্তিক ও ক্রমাগত; ডারউইনের মানুষ সরল ও একমুখীন; সে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করে, সে তার চাহিদাকে তৃপ্ত করে এবং জাগতিক বাস্তবতার দিকে ছোটে। কিন্তু আইনস্টাইন যেমন খণ্ডন করেন নিউটনের ধোঁয়াচ্ছন্ন ও দুঃখবাদী বিজ্ঞানভাবনাকে, তেমনি সভ্যতার ব্যর্থতা চুরমার করে দেয় মানুষের ডারউইনীয় ভাবমূর্তিকে। মানুষ ভয়, অতৃপ্তি ও সন্দেহ দ্বারা আচ্ছন্ন, ফলত সে অব্যাখ্যাযোগ্য। এটা যদি সত্য হয় যে, আমরা জেগে উঠি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এবং সর্বনাশাক্রান্ত হই যথেচ্ছ আনন্দযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তাহলে তার কারণ এই যে, আমরা পশুদের চেয়ে আলাদা এবং সে কারণেই বলা হচ্ছে, man is not "tailored" according to Darwin, nor is the universe is "tailored" according to Newton.

মানবতাবাদের অর্থ

দুই বিখ্যাত বস্তুবাদী চিন্তাবিদ, প্রাচীন আমলের এপিকিউরাস এবং আধুনিককালের হলবাক জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন শুধু যন্ত্রণামুক্ত আনন্দ উদ্‌যাপনের আধাররূপে। এখানে বস্তুবাদ গুরুত্ব দিচ্ছে এমন কিছুর ওপর যা পশু ও মানুষ উভয়ের জন্যেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ধর্ম গুরুত্ব দেয় তার ওপর যা পশু ও মানুষকে আলাদা করে। কতক ধর্মীয় আচার ও বিধি–নিষেধ এই পার্থক্যকরণের জন্যে যথেষ্ট।

মানুষের পশু প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্যে বস্তুবাদ অনেক সময় বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে মতবাদকেই প্রশ্রয় দিয়েছে বেশি।[২১]

www.pathagar.com

ডারউইন মানুষকে জানিয়েছেন যে তার উৎপত্তি পশুবৎ অবস্থা থেকে এবং এই তথ্য থেকেই তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকে সাজিয়েছেন। তাদের ভাষায় মানব সমাজ হল একপাল সভ্য পশুর প্রতিষ্ঠান। এই পশুরা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা পরিহার করবে, প্রকৃতির ওপর নিজেদের ক্ষমতার ব্যবহার করবে এবং বেঁচে থাকবে বোধ-বুদ্ধি সংযোগে, আধ্যাত্মিকতা দিয়ে নয়।

পশু ও মানুষের মধ্যে এই ঐক্য ও সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিবর্তনবাদ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যকার পার্থক্যটিকেও নিশ্চিহ্ন করেছে। কিন্তু একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম এই পার্থক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ধর্ম বলছেঃ দেখ, পশুরা কি করে এবং তোমরা এর বিপরীতে যাও। তারা উদরপূর্তি করে, তোমরা উপোস কর; তারা পালবদ্ধ হয়ে বাস করে, তোমরা একাকী থাক, তারা আনন্দ-ফূর্তি করে বেড়ায়, তোমাদের উচিৎ কষ্ট-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাকে ধারণ করা। এক কথায়, তারা বেঁচে থাকে শরীর নিয়ে, তোমাদের বেঁচে থাকা উচিৎ আত্মা সহযোগে। এই যে প্রত্যাখ্যান, এই যে নিষেধাজ্ঞা তা-ই ধর্মের প্রাণ, কামু যাকে বলছেন Refusal এবং হোয়াটহেড বলছেন Great Rejection.

একটি পশু বস্তুর মতই নির্দোষ, নিষ্পাপ ও নৈতিকতা-নিরপেক্ষ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে রকম নয়। পৃথিবীতে তার 'পতনে'র প্রেক্ষাপটটি সামনে রেখে আমরা তাকে নিষ্পাপ বলতে পারিনে। যদি মানুষ পূর্ণগুণধর পশু (perfect animal) হত, তাহলে তার জীবন হত সরল ও রহস্যহীন। কিন্তু যেহেতু মানুষ তা নয়, যেহেতু সে "পৃথিবীর কীট এবং একই সাথে স্বর্গের শিশু", যেহেতু সে সৃষ্ট, সেহেতু তার মধ্যে সরল সৌসংহতি অসম্ভব। কাজেই শুধু স্বর্গময়তা নয়, বরং আমাদের পাপপঙ্কিলতাও 'সৃষ্টি'র অনুষঙ্গী। এখানে আমরা যেমন পাই মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মৌলিক ট্র্যাজেডি, তেমনি পাই সংকট, অতৃপ্তি, নিষ্ঠুরতা, নিন্দা, দ্বেষ ইত্যাদি।[২২] কোন পশুতে এগুলো আরোপযোগ্য নয়।

সৃষ্টির প্রশ্নটি সত্যিকার অর্থে মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নের সাথেও জড়িত। কেউ যদি মনে করেন, মানুষের সকল কার্যকলাপ পূর্বনির্ধারিত এবং তার কোন স্বাধীনতা নেই, তাহলে এই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার ও বোঝার ব্যাপারে স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন তিনি। কিন্তু কাউকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তার মধ্যে যদি দায়িত্ববোধ অংকুরিত হয়, মৌনভাবেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক, তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করবেন। শুধু স্রষ্টাই একটি স্বাধীন প্রাণ সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং স্বাধীনতা উত্থিত হতে পারে সৃষ্টিসাধনের মধ্য দিয়েই।[২৩] এই স্বাধীনতা বিবর্তনের ফলশ্রুতি হতে পারে না। স্রষ্টা উৎপাদন কিংবা নির্মাণ করেন না, তিনি সৃষ্টি করেন। একজন ভাস্কর নিখুঁত ভাস্কর্য তৈরি করতে পারেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৃজন করতে পারেন না। ক্রমঅগ্রবর্তী সভ্যতার কোন পর্বে মানুষ রোবটের চেয়েও উন্নত

www.pathagar.com

যন্ত্রমানব তৈরি করতে সক্ষম হবে। তা মানুষের সকল ক্ষমতার অধিকাংশই হয়ত ধারণ করবে, কিন্তু একটি ব্যাপার নিশ্চিত যে, তার কোন স্বাধীনতা থাকবে না। পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামের বাইরে কিছুই করার থাকবে না তার। এখানেই খোদায়ী সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য। স্রষ্টা মানুষকে শুধু তৈরিই করেন নি, তার মধ্যে ইচ্ছাস্বাধীনতার বীজ প্রবিষ্ট করেছেন যার মাধ্যমে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে সৎ হবে না অসৎ হবে। এই যে ভালমন্দ নির্ধারণী ক্ষমতা– এটাই বোধ করি এই মহাজগতে অস্তিত্বশীল সকল ধারণার সেরা, যা শুধু মানুষেই প্রবর্তিত। (পশু ও ফেরেশতা–উভয়েই স্বাধীনতানিরপেক্ষ)।

মানুষের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন মেনে নেওয়া হয় যে, মানুষ একজন স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট। মানুষে মানুষে সাম্য কোন প্রাকৃতিক, দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত নয়, এটা আধ্যাত্মিক প্রযোজনা। সাম্য নির্ভরশীল মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বসমূহের সমঝোতার ওপর। অন্যদিকে রাজনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা, শ্রেণীগত দলবদ্ধতা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে সাম্য সহজসাধ্য নয়। যদি মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যমানতাকে অস্বীকার করা হয় তাহলে মানবসাম্যের প্রকৃত ভিত্তিটি হারিয়ে যায়। সাম্য তখন সারবত্তাহীন একটি শব্দে পরিণত হয় মাত্র এবং তা মানুষের শাসন করা ও শাসিত হওয়ার সাধারণ প্রবণতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মানুষের মূল্য বায়োলজি, মনস্তত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞান দিয়ে আবিষ্কৃত হতে পারে না। সক্রেটিস, পিথাগোরাস ও সেনেকার নৈতিকতা তিনটি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম–ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের নৈতিকতা থেকে কম অর্থপূর্ণ নয়। তথাপি সেখানে একটি পরিষ্কার পার্থক্য বিদ্যমানঃ শুধু প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের নীতিই এক স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানুষের সাম্যকে স্বতঃসিদ্ধ করেছে, যেখানে এমন কি প্লেটো পর্যন্ত মানুষে মানুষে বিভেদকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোর কেন্দ্রীয় ধারণা এই যে, মানুষ একটি সাধারণ উৎস থেকে সৃষ্ট; কাজেই চূড়ান্ত সাম্য অনিবার্য। কেন মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় এত প্রতিবন্ধী মানুষের ভীড়? শুধু সৃষ্টিকর্তার ঘরগুলোই খোলা তাদের জন্যে যারা স্বাস্থ্য–সম্পদে শূন্য, যারা এই পৃথিবীর সমস্ত উৎসব ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। বংশগৌরব, নাম, প্রতিপত্তিই অন্যত্র সবচে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু স্রষ্টার ঘরে একজন অন্ধ, দরিদ্র কিংবা প্রতাপশালীর সমান মর্যাদা।[২৪] গীর্জা–মসজিদেরসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও মানবিক অর্থময়তা এই সাম্যের মধ্যেই নিহিত।

শিল্পেরও সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ক্ষুদ্র, সমাজপরিত্যক্ত ও জীবনের যাবতীয় পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মানুষের মধ্যকার মানবীয় গুণাবলীর উদ্‌ঘাটন তথা সকল মানবিক আত্মার সমান্তরাল উদ্বোধন। যে মানুষের সামাজিক অবস্থান যত নীচু, শিল্পে তার মূল্য নির্ধারণী প্রক্রিয়া তত বেশি আকর্ষণীয়। স্মরণ করুন কাসিমদো, ফানডাইন ও জাঁ ভালজার মত

www.pathagar.com

চরিত্রগুলোকে। ক্লাসিক্যাল রুশ সাহিত্যের মূল্যও নির্ধারিত এই সত্য দ্বারা।[২৫]

দানশীলতা, ক্ষমা কিংবা সহনশীলতা মানবতা নয়, যদিও এগুলো মানবতারই ফলশ্রুতি। মানবতা প্রথমত মানুষ এবং তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তার মূল্য প্রদান। যা কিছু মানুষের ব্যক্তিত্বকে হীন করে, যা তাকে সামান্য বস্তুতে নামিয়ে আনে, তা অমানবিক। যেমন, মানুষকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়াটা মানবিক। কিন্তু কোন মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ করতে বলা, তার মতকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা, অতঃপর তাকে ক্ষমা করা–এটা অমানবিক। একজন মানুষকে তার বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টার চেয়ে তাকে হত্যা করা অনেক বেশি মানবিক। সুতরাং এমন কিছু ক্ষমা আছে যা অমানবিক, আবার এমন কিছু শাস্তি আছে যা মানবিক। মানুষকে শুধু ভোক্তা ও উৎপাদকের স্তরে নামিয়ে আনাটা মানবতাকে নির্দেশ করে না, বরং তা বিমানবিকীকরণের নামান্তর। একইভাবে মানুষকে তথাকথিত 'সঠিক' ও সুশৃংখল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণটিও অমানবিক। শিক্ষাও অমানবিক হতে পারে যদি তা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না শেখায়। মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার কাজটি করে দেওয়াও এক ধরনের অমানবিকতা। মানুষ হিসেবে আমাদের গুণাবলীই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষকে ভালমন্দ নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদানের অর্থ মানুষের সর্বোচ্চ মূল্যটিকেই সংযুক্ত করা তার সাথে।[২৬] ধর্ম ও অন্তর্চৈতন্য ব্যতিরেকে মানুষের সর্বোচ্চ মূল্যমানতা নির্ধারণ করা যায় না এবং যিনি মানুষকে সৃষ্ট জীব হিসেবে স্বীকার করেন না, তিনি মানবতার সত্যিকার অর্থটিও বুঝতে অক্ষম। যেহেতু তিনি তাঁর চিন্তার মৌল ভিত্তিটিকে হারিয়েছেন সেহেতু তিনি মানবতাকে নামিয়ে আনবেন শুধু দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে। নিশ্চয়ই সকল মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আজকের স্বচ্ছন্দ সমাজগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে যে, উদরপূর্তি ও আনন্দযজ্ঞের মধ্যে আমরা একটি সুন্দর ও সাবলীল পৃথিবী পাব। এই যে খাদ্যভিত্তিক সাম্যসাধন, সামঞ্জস্য এবং সমাজের স্বার্থে নৈর্ব্যক্তিকরণ–এগুলোর বাস্তবায়নের ফলে, যেমনটি তাঁর Brave New World বইয়ে আলডুস হাক্সলী বলছেন, কোন সামাজিক সমস্যা থাকবে না এবং সমতা, সামঞ্জস্য ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে সর্বত্র। কিন্তু আমাদের আলোচনার এ পর্যায়ে সচেতনভাবেই হোক আর সহজাতবশতই হোক, এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করি, কারণ তা সাধারণ বিমানবিকীকরণের একটি বড় মাপের উদাহরণ ছাড়া কিছুই নয়। 'মানুষ তার পরিবেশের উৎপাদন'–বস্তুবাদের এই মৌল ধারণা থেকে পরবর্তীকালের সকল অমানবিক তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে আইন ও সমাজবিদ্যায়, যার বীভৎস রূপ ব্যক্ত হয়েছে নাজীবাদ ও স্তালিনবাদে এবং মানুষ কর্তৃক সমাজকে সেবা করার প্রচেষ্টাযুক্ত অন্যান্য তত্ত্বও এখানে যুক্ত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

মানুষ অবশ্যই কারো সেবক নয়; সে কোন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। মানুষই সকল সেবার প্রাপক এবং সে সেবা করবে শুধু তার স্রষ্টাকে; এটাই মানবতার চূড়ান্ত অর্থ।

টীকা

১. "No dividing line between man and brute", John Watson, "Psychological Review" no. 20, 1913, P. 158/American Psychological Association, Washington.

২. Gryorgy Lukacs, Existentialism or Marxism.

৩. Ivan Pavlov, Psychologic Experimentale.

৪. H. Berr, Morgan লিখিত L. Humanite Prehistorique বইয়ের ভূমিকায়।

৫. বিবর্তনের ধারণাটি সব সময়ই নাস্তিকতার সাথে যুক্ত। প্রজাতির উৎপত্তি ও বিলোপ বিষয়ক ধারণার আদি প্রবক্তা হলেন রোমান কবি লুক্রিটাস যিনি তাঁর নাস্তিকতা ও সুখবাদের জন্যে সুপরিচিত।

৬. F. Engles, The Influence of Work in the Evolution of Man.

৭. See the investigations of Professors Frosch, Lorenze, Zinkin and others.

৮. এ বিষয়ে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে এই তথ্য থেকে যে, কোন কোন ধর্মে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকার অর্থ হল উপোস ঃ যেমন, খ্রিস্টানদের Vow of Silence.

৯. গোষ্ঠীভিত্তিতে পশুদের সৃষ্টি করার খোদায়ী পরিকল্পনা কুরআনে প্রতিফলিত হচ্ছে এভাবে, "আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মত এক একটি শ্রেণী।" (৬ঃ৩৮)

১০. Lucien Henry, The Origin of Religion.

১১. H. G. Wells, Short History of the World, Pelican Books, 1946, P. 51.

১২. "আমরা প্রাচীর, রাজা, সভ্যতা, সাহিত্য কিংবা থিয়েটারহীন নগরীর কথা জানি, কিন্তু কখনোই উপাসনালয়হীন কোন নগরীর কথা জানি না।" বলছেন প্লুটার্ক। প্রায় দু' হাজার বছর পর একই কথা বলছেন বার্গসোঁ, "বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শনহীন সমাজ অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

www.pathagar.com

কিন্তু ধর্মহীন সমাজের অস্তিত্ব কখনোই ছিল না, এখনও নেই।"

H. Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris/Librairie Felir Alcan/, 1932 PP. 105.

১৩. Reinach, Cults, Myths and Religion.

১৪. "Primitive man does not know a world without life" U.A. Frankfurth, From Myth to Philosophy, Serbocroatian translation,/Minerva/1967 P. 12.

১৫. Simle, at 1976 arachelogical congress in Nice.

১৬. নীটশের অতিমানব নৈতিক সংস্কার থেকে মুক্ত : "করুণা, বিবেক, ক্ষমা-এইসব মানবিক দৈত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, দুর্বলকে উৎখাত কর, তাদের শরীরের ওপর দিয়ে তর তর করে এগিয়ে যাও। তোমরা উচ্চতর প্রজাতির সন্তান, তোমরা অতিমানব।"

Nietzsche, Thus Spoke Zaratustra, Serbocroatian translation Zagreb/Maldost/, 1976.

১৭. এই জাতীয় অনেক দৈত্য সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যে। এগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল নৈতিক বোধের অনুপস্থিতি ও অতিবুদ্ধি।

১৮. এ ব্যাপারে সোভিয়েত বিজ্ঞানী Bukin-এর বিখ্যাত গবেষণাকর্ম রয়েছে।

১৯. Camus, L'homme revolte.

২০. Huizinga, Homo Ludens.

২১. যেমন, এঙ্গেলস প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের উন্মুক্ত যৌনচর্চা (নরনারীর অবাধ যৌনমিলন) বিষয়ে যে ধারণা, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবু তিনি এই ধারণার ওপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন তাঁর The Origin of the Family, Private Property and the State বইয়ে। বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, বরং মতাদর্শগত সিদ্ধান্তই এখানে গ্রাহ্য হয়েছে।

২২. তুলনা করুন কুরআন, ৯১:৭৮।

২৩. Karl Jaspers বলছেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতন হয়, তখন সে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়েও নিশ্চিত হয়। স্বাধীনতা ও স্রষ্টা অবিচ্ছেদ্য।" অথবা "যদি স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টার চেতনার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে স্বাধীনতার প্রত্যাখ্যান এবং সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাখ্যানের চেতনার মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে"-Introduction to Philosophy, Serbocroatian translation, Beogard/Prosveta/1976, P. 158.

www.pathagar.com

২৪. কুরআন ৮০:১-৯।

২৫. Virginia Woolf তাঁর "The Russians and Their Views" প্রবন্ধে বলছেন, "রুশ সৃষ্টিশীল গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আত্মাকেন্দ্রিকতা, যা চেকভের হাতে হয়েছে সূক্ষ্ম ও পেলব, দস্তয়েভস্কির হাতে হয়েছে গভীর ও উন্নত—দস্তয়েভস্কির উপন্যাস তুলে ধরে দমকা হাওয়া, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বোধ যার মধ্যে আমরা হারিয়ে যেতে থাকি। আত্মার কোলাহলে যেন জেগে ওঠে আত্মা।"

২৬. কুরআন ৯০:৮-১৭, "আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? বস্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাস মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান এতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলিধূসরিত মিসকীনকে। অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান আনে ও পরস্পরকে সবর ও দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই সৌভাগ্যশালী।"

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

দ্বৈতবাদের স্রোত

আমরা প্রায়শ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখি, কিন্তু এই প্রত্যয় দুটি অভিন্ন নয়।[১]

সংস্কৃতির শুরু সৃষ্টিযজ্ঞ তথা "Prologue in heaven"-এর সাথে। সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি ও দর্শন সহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস পারমার্থিক জগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে উচ্চকিত করে। সকল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানুষের স্বর্গীয় উৎপত্তির ধারণার প্রতি স্বীকারোক্তি কিংবা অস্বীকৃতি, সন্দেহ কিংবা স্মৃতিচারণ; সংস্কৃতি এই হেঁয়ালি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এই হেঁয়ালিই যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ করে চলেছে সে।

বিপরীতক্রমে সভ্যতা হল প্রাণীবিদ্যক ও একরৈখিক জীবনের ধারাবাহিকতা যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান–প্রদান চলে। এখানে মানব জীবনের সাথে পশু–জীবনের পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু মাত্রা, স্তর ও সংগঠনের দিক থেকে, গুণগত প্রেক্ষাপটে নয়। এ পর্যায়ে মানুষ পরাজাগতিক রহস্য, হ্যামলেট কিংবা কারামাজোভের মত কালজয়ী চরিত্রের শাশ্বত অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা আক্রান্ত নয়। সমাজের অসংখ্য বেনামী সদস্য এখানে প্রকৃতিপ্রদত্ত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করে এবং পৃথিবীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন–পরিবর্ধন করেথাকে।

সংস্কৃতি হল মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের ওপর স্বয়ং মানুষেরই (man's influence on himself) প্রভাবের ফলশ্রুতি, যেখানে সভ্যতা হল প্রকৃতি তথা বাহ্য পৃথিবীর ওপর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবের ফল। সংস্কৃতি হল "মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট" যেখানে সভ্যতার অর্থ হল শৃংখলা, ক্রিয়া ও যথার্থতা। সংস্কৃতি হল "অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা", সভ্যতা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এখানেই মানুষ ও বস্তু তথা humanism ও chosism[২]-এর মধ্যেকার বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়।

ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধূলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণগাঁথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে–এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখণ্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে। এ হল "এক প্রজ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।"[৩]

সভ্যতা পারমার্থিক নয়, বরং কলাকৌশলগত প্রগতির ধারাবাহিকতা, ঠিক যেমনটি

www.pathagar.com

ডারউইনীয় বিবর্তন মানবিক নয়, জীববিদ্যক প্রগতির ধারাবাহিকতা। সভ্যতা হল আমাদের পূর্বপুরুষদের চারপাশে অস্তিত্বশীল অচেতন, অর্থহীন, প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক উপাদানসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন। কাজেই সভ্যতা নিজে ভালোমন্দ নিরপেক্ষ। মানুষের নিশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণ যেমন সহজাত, তেমনি সভ্যতার সৃজনও স্বাভাবিক। সভ্যতা একাধারে আমাদের অন্তর্গত স্বাধীনতার অন্তরায়, আবার আমাদের জন্যে অপরিহার্যও বটে। বিপরীতক্রমে সংস্কৃতি হল মানবিক স্বাধীনতারই নির্বাচন ও প্রকাশন।

সভ্যতায়, বস্তুর ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। এক হিসেব মতে প্রত্যেক মার্কিন প্রতি বছর অন্তত ৮ টন বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিনিয়ত নতুন চাহিদার সৃষ্টি ও সেই চাহিদা পূরণের ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান ত্বরান্বিত ও ঘনট করে; সেখানে বাহ্যিক জীবন যাপন ছন্দ উচ্চকিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠ জীবনের সুরটি চাপা পড়ে যায় সভ্যতার যান্ত্রিকতার তলে।

"Produce to gain, gain to squander"—সভ্যতায় এই ভাবনা সহজাত। অপরদিকে প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সুরকে জোরালো করতে। সকল সংস্কৃতিতে পাওয়া সন্ন্যাসবৃত্তি ও আত্মঅস্বীকৃতির ব্যাপারটি এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধর্মের "সংযত আকাঙ্ক্ষার" নীতির পরিবর্তে সভ্যতাকে এই ভিন্নধর্মী মন্ত্রকে লালন করতে হয়েছেঃ "প্রতিনিয়ত তৈরি কর নতুন আকাঙ্ক্ষা।"[৪] কিন্তু এই দুই দাবির অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য দুর্ঘটনাপ্রসূত নয়; এই দুই বিপরীতধর্মী দাবি মানব চরিত্রের দুই অপরিহার্য দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতিরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন, সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে-এর মাধ্যম হল চিন্তা, ভাষা ও লেখনী।[৫] সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক স্বর্গজগত ও ইহজগতের বা Civitas Dei ও Civitas Solis-এর সম্পর্কের অনুরূপ। একটি নাটকীয়তার (drama) প্রতিনিধিত্ব করে, অপরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইউটোপিয়ার।

ট্যাসিটাস বলছেন যে, রোমানদের চেয়ে বার্বাররা তাদের দাসদের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল আচরণ করত। সাধারণভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যেকার সীমারেখা বোঝার জন্যে প্রাচীন রোমকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, অমানবিক শাসকশ্রেণী ও অসংখ্য নিরাবয়ব মানুষ, নিম্নতম প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, মিথ্যে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ছলচাতুরি, খ্রিষ্টান হত্যা, গ্লাডিতোরিয়া (রোমের শাসক ও সামন্ত শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রদর্শিত দাসদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ খেলা), নীরো ও কালিগুলার আচরণ-এ সবই যে

www.pathagar.com

রোমান সভ্যতার সত্য চিত্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির কতটা সেখানে ছিল কিংবা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়। স্পেঙ্গলার তাই বলছেন, "Hellenic soul and Roman intellect—that is the difference between culture and civilization"[৬]–একইভাবে মায়া সংস্কৃতি, প্রাচীন জার্মান ও স্লাভ এবং ভারতীয় আদিবাসীদের সংস্কৃতিও রোমানদের সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত।

ইওরোপীয় রেনেসাঁও এই প্রেক্ষিতে ভাল দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যুগটি এক ধরনের পতনোন্মুখতার যুগ। রেনেসাঁর আগের শতকে ইওরোপে এক সত্যিকার অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়, যা সম্ভব হয় বর্ধিত উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে এবং জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে। কিন্তু রেনেসাঁর যুগ বলে পরিচিত পরবর্তী দু'শ' বছরে (১৩৫০–১৫৫০) এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের অনেকখানিই হারিয়ে যায়। পৃথিবীর পরিবর্তে শুধু মানুষ ও মানবমুখে একনিষ্ঠ থাকায় বাস্তবতার প্রতি এক অলস ঔদাসীন্য দেখা দেয় এ সময়ে। এই রেনেসাঁর যুগে একের পর এক যখন পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ স্থবিরতা ও পরিষ্কার অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠছিল যার সাথে যোগ হয় জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪ মিলিয়ন; এক শ' বছর পরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২·১ মিলিয়নে। চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্সের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজারে হ্রাস পায়।

কাজেই দুই ধরনের প্রগতি রয়েছে যাদের মধ্যে মূলত কোন আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্য কথায় 'সংস্কৃতির প্রগতি' ও 'সভ্যতার প্রগতি' সমান্তরালবর্তী নয়।[৭]

শিক্ষা ও ধ্যান

সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতি মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন, অপরটির প্রয়োজন ধ্যান।

ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেওয়ার অন্তর্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা যা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্যান এগিয়ে নিয়ে যায় বিচক্ষণতা, নমনীয়তা, প্রশান্তি বা অন্য কথায় Greek Catharsis–এর দিকে। এটা হল কতক ধর্মীয়, নৈতিক ও শৈল্পিক সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিবেদন ও নিমজ্জিত করা। অপরদিকে শিক্ষা হল প্রকৃতিকে জানা এবং স্বীয় অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির দিকে ফেরা। বিজ্ঞান প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ,

www.pathagar.com

বিভাজন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি যেখানে ধ্যানের অর্থ খাঁটি উপলব্ধি' (নব্য প্লেটোবাদে ধ্যান উপলব্ধির পরাবৌদ্ধিক মাধ্যম)। ধ্যানমূলক পর্যবেক্ষণ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত (সপেনহাওয়ার বলছেন); এই ধ্যান কোন বৈজ্ঞানিকের পথ নয়, তা একজন কবি, একজন ভাবুক বা একজন শিল্পীর পথ। একজন বৈজ্ঞানিকেরও ধ্যানের রাজ্য অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ মাত্রই বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানী থাকেন না, তিনি হয়ে পড়েন অখণ্ডসত্তা এক শিল্পী। ধ্যানে নিজের ওপর আধিপত্য করা যায়, বিজ্ঞান সাহায্য করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। আমাদের স্কুল–কলেজের শিক্ষা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সংস্কৃতিকে নয়।

আজকের দিনে মানুষ শেখে; অতীতে মানুষ ধ্যানমগ্ন হত। কিংবদন্তী বলে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মহামতি বুদ্ধ তিন দিন তিন রাত্রি নদীর ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, সময়চেতনা বিস্মৃত হয়ে। জেনোফেন সক্রেটিস সম্পর্কে একই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ একদিন সকালে সক্রেটিস একটি জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন যার সহজ সুরাহা হচ্ছিল না; দুপুর গড়িয়ে গেল, তিনি ঠাঁই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন কেউ কেউ ঔৎসুক্য সহকারে ঘটনাস্থলের অদূরে তাদের মাদুর এনে অবস্থান নেয় যাতে তারা তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে। সক্রেটিস দিনাবসানের পর সারা রাত্রিও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি সূর্যের দিকে ফিরে প্রার্থনা করেন, তারপর নিজের পথে পা বাড়ান।[৮]

টলস্টয় তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে, যেখানে ইওরোপীয় সভ্যতার প্রবাদপুরুষ গ্যালিলিও সারা জীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি শরীরের পতনজনিত সমস্যার সাথে। ধ্যান করা বা শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ দুই ধরনের কর্মকাণ্ড বা দুই ধরনের শক্তি যা দুই ভিন্ন লক্ষ্যে নিবেদিত। প্রথমটি বেতোফেনকে তাঁর 'The Ninth Symphony' সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নেয়; দ্বিতীয়টি নিউটনকে এগিয়ে নেয় 'The Law of Gravitation' আবিষ্কারের দিকে। এভাবে ধ্যান ও শিক্ষার মধ্যকার বৈপরীত্য আরেকবার পুনরাবৃত্ত করে মানুষ ও পৃথিবী, আত্মা ও বুদ্ধিমত্তা কিংবা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যেকার বৈপরীত্যকে।

ধ্যানের বিষয়বস্তু কি?

প্রকৃতিতে বহুবিধ বাস্তব উপকরণ সহজলভ্য যার সাহায্যে মানুষ পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে যে জিনিষ অনুপস্থিত সেটি হল আত্ম (Self) বা ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে মানুষের সাথে শাশ্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই আত্ম বা অহম বা 'আমিত্ব'–এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে পৃথিবী ও পর জগতের বাসিন্দা হতে পারে।

www.pathagar.com

এরই মাধ্যমে সে পারমার্থিকতা ও অন্তর্গত স্বাধীনতার অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে। কাজেই ধ্যান হল আত্মসমুদ্রে অনবরত অবগাহন করা, নিজেকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করা; ধ্যানের সাথে সামাজিক প্রশ্নমালার কোন সম্পর্ক নেই।

ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড নয়। একজন বিজ্ঞানী একটি নতুন মডেলের প্লেন তৈরি করতে গিয়ে ধ্যান করেন না; তিনি চিন্তা করেন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার করেন। কিন্তু একজন সাধু, একজন কবি বা একজন শিল্পী ধ্যান করেন। তাঁরা সত্যানুসন্ধান ও এক মহিমময় রহস্যের উন্মোচনের পথে বিচরণ করেন। এই সত্যানুসন্ধান সবকিছু, আবার কিছুই নয়; একটি আত্মার নিকট সবকিছু, বাদবাকি পৃথিবীর নিকট কিছুই নয়।

কাজেই ধ্যান একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। এ্যারিস্টটলের নিকট যুক্তি ও অনুধ্যানের মধ্যে পার্থক্য মানবিক ও স্বর্গীয়–এর মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রার্থনার অর্থ ধ্যান। খ্রিস্ট ধর্মের 'Contemplative Order' একই ব্যাপার। স্পিনোজা অনুধ্যানকে নৈতিকতার চূড়ান্ত ফর্ম ও উদ্দেশ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

শিক্ষা মানুষকে অধিকতর ভাল, অধিকতর স্বাধীন বা অধিকতর মানবিক করে না। পরিবর্তে শিক্ষা মানুষকে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর সমর্থ ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পশ্চাৎপদ মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মানুষেরা অকল্যাণকর কাজে বেশি পটু। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক অল্প শিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অযৌক্তিক ও বশ্যতামূলক আগ্রাসনের ইতিহাস। শিক্ষার উচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী তৎপরতাকে মসৃণ করার জন্যেই সব রকমের সহায়তা করেছে।

গণসংস্কৃতি

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়। এখন প্রশ্ন হলঃ তথাকথিত গণসংস্কৃতি (mass culture) কি সংস্কৃতি নাকি সভ্যতারই একটি প্রকল্প বিশেষ?

যে কোন সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ, ব্যক্তি হিসেবে, ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হল mass বা man-mass[৯]। একজন মানুষের আত্মা রয়েছে, কিন্তু একদঙ্গল জনতার চাহিদা ছাড়া কিছুই নেই। সুতরাং সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান, যেখানে গণসংস্কৃতি হল শুধু প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার যোগানদার। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তা অভিমুখী, গণসংস্কৃতি পরিচালিত ঠিক বিপরীতক্রমে ঃ সার্বিক সমরূপতা (uniformity)

www.pathagar.com

তথা নৈর্ব্যক্তিকরণের দিকে।

একটি সর্বব্যাপ্ত ভুল হল গণসংস্কৃতির (mass culture) সাথে লোকসংস্কৃতিকে (popular culture) এক করে দেখা। এটা লোকসংস্কৃতির জন্যে ক্ষতিকারক কারণ তা গণসংস্কৃতির চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে স্বতন্ত্র, খাঁটি, সক্রিয় ও জীবন্ত। এর মধ্যে কোন চটকদারি নেই।

লোকসংস্কৃতি সৃজন ও অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হল নিপুণতার সাথে অন্যকে বশে আনা। নাচ, গান, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি একটি গ্রাম কিংবা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ সম্পদ। এগুলো তারা পরিবেশন করে তারাই উপভোগ করে সকলে মিলে, অকৃত্রিম বন্ধন ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংস্কৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক ও ভোক্তা–এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারেন? তথাকথিত গণমাধ্যম–সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকতক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় অফিস, অপরদিকে লক্ষ কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শকশ্রোতা।

১৯৭১ সালে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রায় সকল ইংরেজ সপ্তাহে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। প্রতি তিনজন ফরাসির একজন কখনো বই পড়ে না; ফরাসি দেশের শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশি মানুষের সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম টেলিভিশন। ব্যালে ও অপেরার স্থান অনুসন্ধান তালিকার একেবারে নীচে। ১৯৭৬ সালে জাপানে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে একই চিত্র পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ ভাগ জাপানি কোনরকম বই পড়ে না, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিন ২·৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Horikara দাবি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গামী উঠতি প্রজন্মের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মান থেকে অনেক নীচে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, টেলিভিশন মানুষের সকল সমস্যার রেডিমেড সমাধান দিয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সহজেই তা সাহিত্যের ও চিন্তনের স্থান দখল করে নিয়েছে; ফলত তা সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব করে তুলেছে।

আমরা দেখছি কিভাবে সরকারি আধিপত্যের মধ্যে রেডিও–টেলিভিশনের মত গণমাধ্যমগুলো গণপ্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। এখন আর মানুষকে শাসন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এখন 'বৈধ'ভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে তাদের শাসন শোষণ, ও 'সত্য'র বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্বচিন্তা ও মতামত গঠনে প্রতিহত করা যাচ্ছে সহজেই এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই গণমাধ্যম দ্বারা।

www.pathagar.com

গণমনস্তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে[১০] অবাস্তব কোন মীথের ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। গণমাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা মানুষের চৈতন্য ও আবেগ এবং অনুপ্রেরণাময় দিকটিকেই বশীভূত করেনি শুধু, বরং মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিকেও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে যে, আরোপিত মতামতটি যেন তারই।[১১]

সকল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। ফলত টেলিভিশন স্বাধীনতার শত্রু হবার পাশাপাশি পুলিশ, জেলখানা ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়েছে। অতীতে শাসকের দাপট হ্রাস করার জন্যে যদি সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে টেলিভিশনের ছদ্মবেশী ক্ষমতা নিবারণের জন্যেও নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গণসংস্কৃতি মনের এমন একটি অবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যাকে Johan Huizinga বলছেন 'ছেলেমানুষি'। তিনি সমকালীন মানুষের আচরণে শিশুসুলভতা লক্ষ্য করেছেন, যেমনঃ হালকা বিনোদনে ভক্তি, পরিপক্ব হিউমারের অভাব, গণশ্লোগান ও মিছিলের দিকে ঝোঁক, ঘৃণা কিংবা ভালবাসা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা প্রসঙ্গে অতিঅভিব্যক্তি ইত্যাদি।

পরিশেষে আমরা যন্ত্রের প্রতি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৃকপাত করতে পারি। যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রতি সংস্কৃতির সহজাত ভীতি ও বিরাগ রয়েছে। Berdjajev বলছেন, "যন্ত্র সংস্কৃতির প্রথম পাপ।" এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আসছে এই কারণে যে, যন্ত্র প্রথমদিকে বিভিন্ন বস্তুর ওপর আধিপত্য করত আর এখন মানুষের ওপর আধিপত্য করতে শুরু করেছে। স্মরণ করুন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ), টলস্টয়, হেইডেগার, নীজবাস্তনী, ফকনার প্রমুখের সতর্ক বাণী। অন্যদিকে মার্কসবাদী Henri Lefebvre সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন ঃ "স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হবে শুধু সেই সমাজে যেখানে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সার্বিক স্ফুরণ ঘটবে এবং সেটা হল কমিউনিস্ট সমাজ।" আসলে যে সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউটোপিয়াকে আদর্শ মানে সে সমাজ যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্র মানুষকে ব্যবহার করে, তাকে নিরাপত্তা দেয় না; শিক্ষা ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা একই কৌশলকেন্দ্রে সকলকে আনতে চায়, অতঃপর ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বকে ভোঁতা করে, তার কর্ম, চিন্তা ও বক্তব্যকে পানসে করে তাকে একটি একক সমাজের (কর্তৃত্বের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

মানববিরোধী প্রগতি

আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমার স্রষ্টা অপেনহেইমারের মতে প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানব জাতি গত চার শ' বছরে যা করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে গত চল্লিশ বছরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মানুষে মানুষে মনোদূরত্ব বেড়েছে $১০^{২৬}$–$১০^{৪০}$, তাপমাত্রা বেড়েছে $১০^{৫}$–$১০^{১১}$, চাপ বেড়েছে $১০^{১০}$–$১০^{১৬}$। আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে পুরনো পিস্টন ইঞ্জিনের পরিবর্তে আসবে পারমাণবিক শক্তিচালিত নৌকা। সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন রাস্তার নীচে শুয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যানবাহন চলাচল করবে। জাঁ রসতান্দ বায়োলজির যাদুকরী সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নকৃত বংশগত সারবস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব জাতি নিজেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম ডিএনএ (DNA-ক্রমোজমের মধ্যে পাওয়া বংশগত সারবস্তুর রাসায়নিক ভিত্তি) উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে নবতর সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। ইচ্ছেমত সন্তান পাওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, মানুষের মস্তিষ্কে যে দশ বিলিয়ন কোষ থাকে তার সাথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত আরও কয়েক বিলিয়ন যোগ করে প্রতিভার ফুলঝুরি ঘটানো যাবে। মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন হবে একটি সাধারণ ঘটনা এবং মস্তিষ্কের অবসাদ ও ধ্বস (lag)-এর কারণ আবিষ্কৃত হলে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার প্রাচীন মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কর্ম সময় কমিয়ে আনবে সপ্তায় ৩০ ঘন্টায়, কর্মবছর হ্রাস পাবে ৯ মাসে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ মিলিয়ন মটর, ৬০ মিলিয়ন টেলিভিশন সেট, ৭·৭ মিলিয়ন নৌকা ও ইয়ট ছিল। একই বছরে আমেরিকানরা শুধু ছুটি কাটানো বাবদ খরচ করে ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিলাসদ্রব্য। এক হিসেব মতে ধনী দেশগুলো (মোট দেশের এক-তৃতীয়াংশ) বছরে শুধু কসমেটিকস-এ খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ সমস্ত দেশে জীবনযাত্রার মান ১৮০০ সালে যা ছিল তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত এখন। আগামী ৬০ বছরে আজ যা আছে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত হবে। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সে সময়ে কি প্রগতির পরাকাষ্ঠার পাশাপাশি মানব জীবন পাঁচ গুণ বেশী সুখী ও মানবিকতাপূর্ণ হবে? স্বতঃসিদ্ধরূপেই উত্তর আসবেঃ না। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে পাঁচ মিলিয়ন অপরাধকর্ম সংগঠিত হয়। সেখানে ভীতিকর অপরাধকর্ম বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে চৌদ্দ গুণ বেশি (অনুপাত ১৭৪ঃ১৩)। একই দেশে প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘন্টায় একটি খুন, প্রতি ২৫ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি ৫ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি করে গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে। সেদেশে প্রতি ১০০০০০ জনে খুন হয় ১৯৫১ সালে ৩·১ জন, ১৯৬০ সালে ৫ জন,

www.pathagar.com

১৯৬৭-তে ৯ জন। পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৬৬ সালে ২ মিলিয়ন অপরাধ কর্মের খবর পাওয়া যায়। ১৯৭০-এ তা এসে দাঁড়ায় ২,৪১৩,০০০-এ। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যতিক্রমহীনভাবে অপরাধপ্রবণতার ঊর্ধ্বগামী চিত্র সুস্পষ্ট।

বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত অপরাধ বিজ্ঞানীদের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৯৭৩, সেপ্টেম্বর) সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান সময় অপরাধের বিশ্বজনীন আগ্রাসন দ্বারা আক্রান্ত। মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীরা হতাশভাবে বলেনঃ 'আমাদের গ্রহ এক 'ক্ষলনের সমুদ্র' অর্থাৎ কম বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। 'বিশ্ব পরিস্থিতি ৭০'-জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয় যে, একটি শিল্পোন্নত দেশে (নাম বলা হয়নি) কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন থেকে (১৯৫৫) দশ বছরে বেড়েছে ২·৪ মিলিয়ন (১৯৬৫)। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক রিপোর্টে বলা হয়, "বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানব জীবন কখনোই এতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি। বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ (ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ), চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি, ডাকাতি, আধুনিক জীবন ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে।"

রুশ মনস্তাত্ত্বিক হোজকভের গবেষণায় দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাদকাসক্তি তুমুলভাবে বেড়েছে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এ মাদকদ্রব্যের বিক্রয় দ্বিগুণ বেড়েছে; ১৯৬৫ সালে এসে তা বাড়ে ২·৮ গুণ বেশি, ১৯৭০-এ ৪·৩ গুণ এবং ১৯৭৩ সালে ৫·৫ গুণ। মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মৃত্যুর হার বার্লিনে ১০০০০০ জনে ৪৪·৩ জন, ফ্রান্সে ৩৫ জন, অস্ট্রিয়ায় ৩০ জন। আমরা মাদকাসক্তিকে দারিদ্র্য ও পশ্চাদ্‌পদতার সাথে সম্পর্কিত ভাবতাম, সেক্ষেত্রে সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে মাদকাসক্তি কেন? প্রাচুর্যের সন্তানেরা কিসের থেকে পালায়ন করতে চায়? ইওরোপের অন্যতম ধনী দেশ সুইডেনে প্রতি দশজনে একজন মাতাল (নারী-পুরুষ)। মাদকদ্রব্যে সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করেও অবস্থা তথৈবচ। পর্নোগ্রাফীর আগ্রাসনও সুস্পষ্ট। সকল ফরাসি প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জুড়েই চলে পর্নো ছায়াছবি। প্যারিসেই ২৫০টি সিনেমা হল শুধু পর্নো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। সেই সাথে যোগ হয়েছে জুয়া। বৃহত্তম জুয়া নগরীগুলো সভ্যতম অঞ্চলে অবস্থিতঃ দোভিলে, মন্টে কারলো, ম্যাকাও, লাস ভেগাস। আটলান্টিক সিটির বিশাল নৃত্যশালার একটি ঘরে ৬০০০ জুয়াড়ীর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। পরিসংখ্যান বলে যে, ১৯৬৫ সালে ফরাসিরা জুয়া খেলায় খরচ করে ১১৫ বিলিয়ন ফ্রাঁ, মার্কিনীরা খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আত্মহত্যা ও মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার সম্পর্ক কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? "মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষের মধ্যেই অতৃপ্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি" -বলছেন একজন মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক। ক্লাসিক সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত উন্নততম সমাজের এই চিত্র প্রগতির প্রতি

www.pathagar.com

বিশ্বাসের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার জনে চারজন মানসিক হাসপাতালের বাসিন্দা, নিউ ইয়র্ক শহরে এই সংখ্যা হাজারে ৫·৫ জন। হলিউডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসিক চিকিৎসকের সমাগম। আমেরিকার গণস্বাস্থ্য সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচজন মার্কিনীর একজনের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি।

১৯৬৮ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরে যে সমস্ত দেশে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক তাদের তালিকায় প্রথম আটটি দেশ হল পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এ সমস্ত দেশে হৃদ্‌রোগ ও ক্যান্সারের পরেই আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর স্থান (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে)। একই সংস্থার '৭০ সালের রিপোর্টে এ ব্যাপারগুলোকে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পারিবারিক ভাঙনের সাথে যুগপৎ হিসেবে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ও শিক্ষাকেও যুক্ত করা যায়। যুগোস্লাভিয়ার অতি উন্নত অঞ্চল স্লোভেনিয়াতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৯৮٪) প্রতি ১০০০০ জনে আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫·৮ জন, কিন্তু অনুন্নত কসোভোতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৫৬٪) মাত্র ৩·৪٪ (অনুপাত ৭ঃ১) ড· এ্যান্থনি বেইলের গবেষণা মতে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা তাদের সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি। কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের বয়সী অন্যদের তুলনায় দশ গুণ বেশি। এটা উদ্বেগজনক কারণ, এখানে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীরা ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত, নয়ত সরকারী বৃত্তিধারী।

এটা ধরে নেওয়া ভুল যে, উপরোক্ত চিত্রটি শুধু পশ্চিমা সভ্যতাতেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা মাত্রেই এর সংযোগ অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইংল্যান্ড বা সুইডেন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, জাপান সম্পর্কেও তা–ই প্রযোজ্য। তবে জাপানের ক্ষেত্রে জাপানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাঠিন্য ও জাপানি পরিবারের ভূমিকা এ পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে এসে বলা যেতে পারে যে, সভ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বায়োলজি যে 'বস্তু' দিয়ে মানুষ সৃষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল মানুষতো তা দিয়ে সৃষ্ট নয়। মানুষ শুধু তার ইন্দ্রিয় সহযোগে বেঁচে থাকে না। "অবাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা বেদনার জন্ম দেয়, বাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা জন্ম দেয় তারল্যের", বলছেন সোপেনহাওয়ার। প্রাচুর্য ও তার সাথে সংলগ্ন মানসিকতা যে কোন মূল্যবোধক পদ্ধতির প্রতি ভক্তিকে হ্রাস, এমন কি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

সরল সহজ জীবন যাপনের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা ধ্বংসের মাধ্যমেও সভ্যতার আগ্রাসী

www.pathagar.com

চেহারা বেরিয়ে আসছে। এখানে দ্বন্দ্বটি আসছে মানব জীবনের যান্ত্রিক ও জীবন্ত, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক নীতির মধ্যে। সভ্যতার আগ্রাসনের কারণেই ব্রাজিলে প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে আশি ভাগের বেশি পানি শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কারখানার চিমনি ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ২৩০ মিলিয়ন টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে প্রবেশ করে। ফরাসি শক্তিকেন্দ্রগুলো ১৯৬০ সালে ১১৪ হাজার টন সালফার গ্যাস এবং ৮২ মিলিয়ন টন অঙ্গার উৎপাদন করে। অনেক প্রতিরোধক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর রুর অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই প্রতি বছর উৎপাদিত হয় ২৭০০০ টন বর্জ্য। ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে ফুসফুসে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে দশ গুণ বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে গত কুড়ি বছরে পঞ্চাশ ভাগ। টোকিওর বিশাল ইয়ানাগা ক্রসওয়ে থেকে নেয়া অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় সেখান দিয়ে পার হওয়া ৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন যাত্রীর রক্ত চলাচলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৭ গুণ বেশি। প্রধান কারণ, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস। শুধু তাই নয়, মোটর যান আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা গিয়েছে তা এই শতকের সমস্ত যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যাকেও হার মানায়।

সভ্যতার মধ্যে এমন কোন ধনাত্মক শক্তি নেই যা সভ্যতার সকল আবিলতা ও অসামঞ্জস্য মোকাবেলা করতে পারে। আসলে সভ্যতার অসুখ সভ্যতার ভিতরকার কোন ঔষধ দিয়ে চিকিৎসাযোগ্য নয়, একে সভ্যতার বাইরে থেকে চিকিৎসা করাতে হবে এবং এটা পারে একমাত্র সংস্কৃতি। কারণ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান কখনো ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না কিংবা সভ্যতা পারে না ক্ল্যাসিকাল কাঠামোতে ফিরে যেতে। The circle is closed.

মঞ্চে বিষাদবাদ

লাক্ষণিক অর্থে অমঙ্গলবোধের দর্শন আসছে শুধু বিশ্বের ধনাঢ্য ও উন্নত অঞ্চল থেকে। যেমন, ইবসেন, হেইডেগার, সেইলার, পিন্টার, বেকেট, ও' নীল, বার্জম্যান, কামু, আন্তনিনি প্রমুখ এরকম অঞ্চলের বাসিন্দা। বিজ্ঞানী, যাঁরা বস্তুর বাহ্যিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেন, তারা সাধারণত আশাবাদী; কিন্তু চিন্তক ও শিল্পীরা, বিশেষত শিল্পীরা বড় বেশি দ্বিধাক্রান্ত।

কিন্তু সাদামাটাভাবে দেখলে একটি জাতির জীবনে বিমর্ষবাদ প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ সাক্ষরতা, সামাজিক নিরাপত্তা, মাথাপিছু আয় কয়েক হাজার ডলারে উন্নীত হবার পর। পরিহাস্য হলেও সত্য উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত স্কান্ডিনেভিয়ান

www.pathagar.com

দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে ভাল থাকলেও সেখানেই উৎপত্তি হয় চূড়ান্ত বিমর্ষবাদী দর্শনের। এ দর্শনে মানুষের ভাগ্য হতাশাপূর্ণ ও ট্র্যাজিক এবং সকল মানুষের চেষ্টা ও অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনর্থক বলে বিবেচিত। তাহলে কি বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য আধ্যাত্মিক নিরানন্দের জন্ম দেয়?

স্বাচ্ছন্দ্য বহির্নিষ্ঠ এবং অনর্থকতার বোধ জীবনের অন্তর্নিষ্ঠ অভিজ্ঞান-সভ্যতায়। দ্বান্দ্বিকভাবে প্রকাশ করলে ঃ যত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য, তত বেশি শূন্যতা ও নৈরাশ্যের অনুভূতি। বিপরীতভাবে আদিম সমাজগুলো দরিদ্র হতে পারে এবং সূক্ষ্ম সামাজিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু তাদের জীবন জীবন্ত, সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অনুভূতির ধারক। ফোকলোর প্রাচীন মানুষের জীবন যাপন ছন্দের অনন্যসাধারণ চিত্রটি উপহার দেয়। অসন্তোষ ও নৈরাশ্য তাদের দরিদ্র জীবনে অনুপস্থিত।

এই মঞ্চেই সভ্য পৃথিবী উন্মোচন করেছে তার মানবিক 'ট্র্যাজেডি।' বিজ্ঞান কর্তৃক সভ্যতাকে উপহার দেয়া শৃংখলা ও নিশ্চয়তার মুকুটকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে থিয়েটার। বিজ্ঞান প্রদান করে থাকে উৎপাদন সামগ্রীর সমৃদ্ধ তালিকা, যান্ত্রিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি; আর শিল্প নির্দেশ করছে মানবিক গুণাবলীর পতনাবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, পশুত্ব ও শূন্যতা। বস্তুগত সমৃদ্ধির মধ্যে থেকে থিয়েটার আবিষ্কার করছে আক্রমণাত্মক, অসহায় ও অপরাধপ্রবণ মানুষকে। এ্যাবসার্ড নাটকগুলো আজকের সবচেয়ে উন্নত সমাজের মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি।

কবিরা যদি মনুষ্য জাতির সংবেদী নিরীক্ষক হন তাহলে তাঁদের ভীতি ও সংশয় দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী মানবতার দিকে এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে উন্মুক্ত বিমানবিকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে।

১৯৬৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা ১৯৭১ সালে আত্মহত্যা করেন। এর দু'বছর আগে ১৯৬৯ সালে আরেকজন জাপানি ঔপন্যাসিক তুকিয়ো মিশিমা একইভাবে জীবনাবসান ঘটান। ১৮৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অন্তত তের জন জাপানি ঔপন্যাসিক ও লেখক আত্মহত্যা করেছেন। জাপানি সংস্কৃতির এই 'অবিরাম ট্র্যাজেডি' হল জাপানের প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশের পরোক্ষ ফল। মৃত্যুর এক বছর আগে কাওয়াবাতা লেখেন, "মানুষ এক কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, যে দেয়াল ভালবাসার সকল সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রগতির নামে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে প্রকৃতির।" 'তুষার রাজ্য' নামক উপন্যাসে কাওয়াবাতা মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ চেতনাকে কেন্দ্রীয় আলোকে তুলে ধরেছেন।

সকল মহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি একইভাবে সভ্যতায় মানুষের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চিত্র

www.pathagar.com

খুঁজে পেয়েছেন। আঁদ্রে মার্লো উনবিংশ শতকীয় আশাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন ঃ "ইওরোপ ধ্বংসাক্রান্ত এবং রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল, ইওরোপ তা করেছেও।" একই চিত্র দেখিয়েছেন পল ভেলরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর।

নাস্তিবাদ বলছে 'পরিপ্রেক্ষিতহীন পৃথিবী'র কথা, বলছে 'ভীষণ নৈঃশব্দে'র কথা, বলছে 'ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন ব্যক্তিত্বে'র কথা–কিন্তু নাস্তিবাদ কোনক্রমেই কোন বিষাক্ত দর্শন নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন। বস্তুত এই দর্শন অত্যন্ত গভীর ও শিক্ষাপ্রদ। এটা সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও অসমর্থনের প্রকাশ যে পৃথিবী তার (মানুষ) মৌলিক ভাবমূর্তিকে আক্রান্ত করেছে। এটা সভ্যতার একরৈখিক বিশ্ববিস্তারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ। একই কারণে কেউ কেউ আধুনিক নাস্তিবাদকে এক ধরনের ধর্মরূপে দেখেছেন এবং ধারণাটি ভিত্তিহীন নয়।

আদিম উদ্বিগ্নতা, কবরপাড়ের চিত্রকল্প, এ পৃথিবী থেকে, যেখানে সে আগন্তুক মাত্র, মুক্তি লাভের পথ অনুসন্ধানের বেপরোয়া প্রচেষ্টা–এ সবকিছুই ধর্ম ও নাস্তিবাদে উপস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, এ প্রচেষ্টায় নাস্তিবাদ কোন পথ খুঁজে পায়নি, কিন্তু ধর্মে এ পথের সন্ধান মিলে গেছে।

বিজ্ঞান, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক সুখ সমস্যার সমাধানে সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতাকে যখন মানুষ উপলব্ধি ও স্বীকার করবে তখনই মনুষ্য জাতির ওপর সবচেয়ে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবটি আসবে। তখন সময় হবে ইতঃপূর্বে গৃহীত কতক চিন্তাধারার পুনর্বিবেচনার। প্রথম পুনর্বিবেচনার বিষয় হবে মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা। কারণ সভ্যতা যদি মানুষের সুখ–শান্তি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মীয় ধারণাটিই সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ধারণাটি মিথ্যে। তৃতীয় কোন বিকল্প নেই।

নাস্তিবাদ

ধর্ম ও আধুনিক নাস্তিবাদের মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় নাস্তিবাদকে সভ্যতার অন্তর্গত একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

নাস্তিবাদ স্রষ্টার অস্বীকৃতি নয়, বরং তার আপাতঅনুপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা যেমনটি বেকেট বলছেন, মানুষের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে তথা এই সত্যের প্রতিবাদ যে, মানুষের ধারণাটি অবাস্তবায়নযোগ্য ও অসম্ভাব্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে ধর্মীয়

www.pathagar.com

ভাবনাকে নির্দেশ করে, বৈজ্ঞানিকতা নয়। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ সম্ভবপর ও বাস্তবায়নযোগ্য। কিন্তু যা কিছু চূড়ান্তরূপে গণ্য তা–ই অমানবিক এবং সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি "man is a futile passion" শুনতেও যেমন, অন্তর্নিষ্ঠ অর্থেও তেমনি—ধর্মীয়। যেহেতু বস্তুবাদে আবেগ নেই, সেহেতু নিরর্থকতার বোধও নেই।

সংসারের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বস্তুবাদ অনর্থকতা ও তুচ্ছতার বোধকে ধারণ করার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। বস্তুবাদী পৃথিবী ও মানুষের একটি প্রায়োগিক লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু 'man is a futile passion' এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে, মানুষ ও পৃথিবী অভিন্ন নয়। পৃথিবীর প্রতি এই রকমের আমূল বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সকল ধর্মের সূত্রপাত। সার্ত্রের অনর্থকতার বোধ এবং কামুর এ্যাবসার্ড একই উদ্দেশ্য ও বোধবৈদগ্ধ্যের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় চরিত্রের, কারণ তা জীবন যাপনের বৈশ্বিক উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে।

স্রষ্টার অনুসন্ধান এক ধরনের ধর্ম। কিন্তু সকল অনুসন্ধানে খোদা মেলে না। নাস্তিবাদী দর্শনে যে উদ্বিগ্নতার প্রকাশ তা সর্বতোভাবেই, শুধু উপসংহার ব্যতীত, ধর্মানুসারী। নাস্তিবাদ ও ধর্ম উভয় মতেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুক মাত্র, কিন্তু নাস্তিবাদের আগন্তুক হতাশায় হারিয়ে যাবার গল্প শোনায়, আর ধর্মের আগন্তুক উচ্চারণ করে মুক্তির পয়গাম।

আলবেয়ার কামুর বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে শুধু একজন হতাশ বিশ্বাসীর চিন্তা–ভাবনা হিসেবেঃ "যে পৃথিবী থেকে হঠাৎ করে আলোর ঝলকানি তিরোহিত হয় সে পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে আগন্তুক ভাবে, তার কাছে এটা মুক্তি সম্ভাবনাহীন নির্বাসন; যেহেতু হারানো মাতৃভূমির কোন স্মৃতি কিংবা প্রতিশ্রুত রাজ্যে পৌঁছানোর কোন বন্দোবস্তও তার কাছে নেই।" অথবা "আমি যদি গাছগুলোর মধ্যে একটি গাছ হতাম তাহলে জীবনের একটি বোধ থাকত কিংবা এই বোধের সমস্যা–ই উদ্ভূত হত না। কারণ তাহলে আমি এই পৃথিবীরই একটি অংশ হতাম যে পৃথিবীকে এ মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে প্রতিরোধ করি।" অথবা "all is allowed since God doesn't exist and man dies". এই শেষের বাক্যটিতে বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদদের ঠুনকো নাস্তিকতার কোন সমর্থন নেই, বরঞ্চ এটা হল সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়া এক আত্মার আহাজারী। এটা হল 'ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত নাস্তিকতা'।

নৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্তিত্ববাদও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। Simone de Bouviore লিখছেন, "শুরুতে মানুষ কিছুই নয়; ভাল বা মন্দ হওয়াটা নির্ভর করছে তারই ওপর, অন্য কথায় তার স্বাধীনতা গ্রহণ বা বর্জনের ওপর। নির্বাচিত স্বাধীনতা তার লক্ষ্যকে চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোন বাহ্যিক শক্তি, এমন কি মৃত্যুও এই স্বাধীনতার

www.pathagar.com

অনুদানকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি এই খেলায় হেরে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও প্রত্যেক মানুষের উচিৎ প্রতিটি মুহূর্তে ঝুঁকি নেওয়া এবং সংগ্রাম করে যাওয়া।" এমন কি সার্ত্রের অস্তিত্বের দ্বৈততা, 'অস্তিত্বের দ্বারা অস্তিত্ব' (etre et soi) এবং 'অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব' (etre pour soi)—এটাও বস্তুবাদের পরিষ্কার অস্বীকৃতি। শুধু প্রতিশব্দগুলো নতুন, সারসত্যটি পুরনো ও সহজে সনাক্তযোগ্য।।

টীকা

১. সংস্কৃতির ইংরেজি culture শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে 'cult' (ল্যাটিন cultus) শব্দটির সাথে সম্পর্কিত। দুটো শব্দেরই উৎপত্তি ইন্দো-ইওরোপীয় শব্দ 'কুল' (Kwel) থেকে। অপরদিকে সভ্যতা বা Civilization সম্পর্কিত 'Civis' শব্দটির সাথে যার অর্থ নাগরিক।

২. Chosism-এর উৎপত্তি ফরাসি শব্দ 'chose' থেকে যার অর্থ বস্তু বা thing; শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডুরখেইম, কোন কিছুকে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরীক্ষা করার প্রেক্ষিতে।

৩. Malreaux : Antimemoirs, Serbocroatian translation, Zagreb, 1969 P. 276.

৪. New York Times-এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে 'নবযুগের প্রথম সূচক'।

৫. Marshall McLuhan প্রমাণ করেছেন যে, লেখনী চিন্তন প্রক্রিয়ায় বিচিত্র পরিবর্তন আনে। তিনি বলছেন, "The use of an alphabet produces and supports the habit of expressing in visual and space terms, especially in terms of uniform space and uniform time, continually and constantly."

M. McLuhan : The Gutenberg Galaxy, Serbocroatian translation, Belgrade, 1973, P. 32.

৬. Oswald Spengler : The Decline of the West, Allen and Unwin Ltd. 1971, P. 32.

৭. একটি মজার দৃষ্টান্ত এই যে, রেনেসাঁর যুগেও মানব মন বিচিত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং তা শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিল্পী ও মানবতাবাদীদেরকেও আক্রান্ত করে। যেমন, "জ্যোতিষতত্ত্বকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান উদারপন্থী চিন্তকরা এবং তা প্রাচীনকালের চেয়েও এ সময়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।" -জানাচ্ছেন রাট্রান্ড রাসেল।

৮. Xenephon, Symposium, P.220.

www.pathagar.com

৯. এই প্রতিশব্দটি সাহিত্যে প্রথম চালু করেন Ortega Y. Gasset; এই 'mass' হল ব্যক্তিত্ব হারানো কতক বেনামী, নিরবয়ব মানব ইউনিটের সমষ্টি।

১০. ১৯৪৫ সাল পর্যন্তও জাপানিদেরকে শিক্ষা দেওয়া হত যে, মিকাডো হল সূর্যদেবীর সন্তান এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে জাপানকে সৃষ্টি করা হয়। এমন কি এই ধারণা শিক্ষা দেওয়া হত বিশ্ববিদ্যালয়েও। পরবর্তীতে আমরা দেখি নতুনতর মীথ। রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ায় এই মীথ গড়ে ওঠে স্টালিন, মাও সেতুঙ ও কিম সুং-কে ঘিরে-গড়ে ওঠে এক ধরনের 'Leader Cult'.

(১১) এ ব্যাপারে চমৎকার আলোকপাত করা হয়েছে Djura Susnjic লিখিত 'Fisherman For Human Souls' বইয়ে।

www.pathagar.com

শিল্প জগত

শিল্প ও বিজ্ঞান

একটি ইঞ্জিনের এক রকম শৃংখলা, একটি সুরখণ্ডের আরেক রকম শৃংখলা। এই দুই শৃংখলা কখনো একই উৎস থেকে উৎসারিত হতে পারে না। প্রথমটি কালিক বা ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের মাত্রিক সমন্বয় এবং প্রকৃতি, যুক্তি ও গণিত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি একটি কবিতা বা সংগীতে শব্দ ও ধ্বনিকে সুসমন্বিত করে। এই দুই শৃংখলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম– অন্যকথায় বিজ্ঞান ও শিল্প–এই দুই ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

পৃথিবীবহির্ভূত অপর এক জগতের ধারণা প্রতিটি ধর্ম ও শিল্পের মৌলিক বিষয়। যদি শুধু এই একটি পৃথিবীই থাকত তাহলে শিল্পের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রতিটি শিল্পকর্ম এমন এক জগতের অনুভব নির্মাণ করে যেখানে আমাদের অবস্থিতি নেই; তাই শিল্প এক ধরনের নস্টালজিয়াও বটে।

একদা একজন বলেছিলেন যে, শিল্প হল সৃষ্টি সুখের উল্লাস তথা মানুষ 'সৃষ্টি'রই আখ্যায়িকা, যেখানে মানুষের অস্তিত্বহীনতাই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত প্রতিপাদন। শিল্প তাই পৃথিবী এবং এর সমস্ত বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও জীববিদ্যক ফর্মুলার বিরোধী। প্রকৃত অর্থে এটি একটি ধর্মীয় বিরোধিতা। ধর্ম, নৈতিকতা ও শিল্প একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা যার আবির্ভাব 'সৃষ্টি ক্রিয়া'র মধ্য দিয়ে। এ কারণে সৃষ্টিতত্ত্ববিরোধী ডারউইনীয় তত্ত্ব শুধু ধর্মের অস্বীকৃতি নয়, নীতি, শিল্প ও আইনেরও অস্বীকৃতি। মানুষ যদি সত্যিই ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী তৈরিকৃত হয় তাহলে শিল্পের কিছুই করার থাকে না এবং কবি ও ট্র্যাজেডিয়ানরা আমাদেরকে যা উপহার দিয়েছেন তা আবর্জনা বলেই মেনে নিতে হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সম্পর্কিত মাত্রা ও গুণের মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপে। বিজ্ঞানের রাণী গণিতকে অগাস্ত কঁৎ সংজ্ঞায়িত করেছেন "মাত্রার পরোক্ষ পরিমাপক" হিসেবে, যেখানে গিয়াকমেত্তি শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "অসম্ভবের পিছু ধাওয়া এবং জীবনের সারসত্যকে ছোঁয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টারূপে।"

শিল্পের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনায় গুণবাচকতা মাত্রাবাচকতার একটি ফর্ম মাত্র। এঙ্গেলস তাঁর 'Dialectics of Nature'-এ বলছেন, "শরীরে সারবস্তু বা গতির যোগ বা বিয়োজন ছাড়া অর্থাৎ শরীর মধ্যস্থিত মাত্রাগত পরিবর্তন ছাড়া শরীরের গুণগত পরিবর্তন অসম্ভব।" প্রকৃতিতে এই মাত্রিক নীতি সূত্রবদ্ধ করেছেন পিথাগোরাস "সংখ্যা ও তাদের সম্পর্কের

www.pathagar.com

মধ্যকার সুসমঞ্জস পদ্ধতি" হিসেবে।

দুজন মানুষ কখনো একই রকম হতে পারে না, দুটি পাথরও হতে পারে না সমরূপ। কোন্ জিনিসটি পানির দু'টি অণু ভিন্ন ভিন্ন করে রাখে? চতুর্মাত্রা তথা স্থানকালে তাদের অবস্থান? কিন্তু আমরা যদি কালকে সীমাহীন ভাবি তাহলে এই পার্থক্যকরণ তার বিজ্ঞানসূত্রীয় বোধটি হারায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্ভব কারণ প্রকৃতিতে কোন গুণধর্ম নেই। গুণবাচকতার বিজ্ঞান বা গুণের বৈজ্ঞানিক ধারণা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতিতে গুণপনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি তা মানবমানসের সংস্পর্শে আসে। তখন সে হতে পারে সুন্দর বা ভয়ঙ্কর, উদ্দেশ্যময় বা উদ্দেশ্যহীন, অর্থময় বা অর্থহীন। অন্যকথায়, নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকৃতিতে গুণারোপ অসম্ভব– প্রকৃতি সমসত্ত্ব ও উদাসীন।

একটি মৌলিক কবিতা, সঙ্গীতখণ্ড বা একটি চিত্রকর্মে আমরা এক ধরনের রহস্যময়তার আভাস পাই, কিন্তু অনুকৃত কর্মে তার কতটা থাকে? কারণ প্রথমত তা গুণ নয়, সংখ্যাবাচক প্রবণতার সাথে যুক্ত এবং দ্বিতীয়ত, সেখানে স্রষ্টার অনুভবের সাক্ষাৎ ছোঁয়া পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পার্থক্যকে নিউটন ও সেক্সপিয়ার— এই দুইটি নামের বরাত দিয়েও বোঝা যেতে পারে। প্রথমজন যান্ত্রিক বিশ্বজগতের মহানায়ক, দ্বিতীয়জন এক কবি যিনি মানব জীবনের প্রত্যন্ত অলিগলির ঠিকানা জানেন। নিউটন ও সেক্সপিয়ার, আইনস্টাইন ও দস্তয়েভস্কি– দুই ভিন্ন পথের পথিক যাঁরা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল নন। মানুষের ভাগ্য, তার নৈঃসঙ্গ, ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু এবং এসব সংকট থেকে উত্তরণ ভাবনা কখনোই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। কিন্তু শিল্পী চেষ্টা করলেও এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন না।

বিজ্ঞান 'আবিষ্কার' করে, শিল্প 'সৃষ্টি' করে। একটি তারকা তার আলো আবিষ্কৃত হওয়ার আগেও অস্তিত্বশীল ছিল। কিন্তু শিল্পচেতনার সাথে তারকালোকের আত্মীয়তা শাশ্বতকালীন। অস্তিত্বহীনতার মধ্যেই শিল্পী অস্তিত্বের আবহ তৈরি করেন তাঁর আনকোরা সৃষ্টি প্রকৌশলযোগে।

বিজ্ঞান 'যথার্থ' কিন্তু শিল্প 'সত্য'। একটি প্রতিকৃতি কিংবা প্রকৃতিলগ্ন চিত্রকর্মের দিকে এবং একটি আলোকচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিন; কোন্‌টিকে অধিকতর মৌল মনে হয়? বিজ্ঞান আত্মাকে 'চেতনকেন্দ্রে' এবং স্রষ্টাকে 'আদি কারণে' পুনর্বাসিত করেছে। বিজ্ঞান নিয়ম আবিষ্কার করতে ও সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু একটি শিল্পকর্ম বিশ্ব জাগতিক শৃংখলার প্রতিফলন ঘটায় সে বিষয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন না তুলেই। ইওরোপীয় বিজ্ঞানের জনক ফ্রান্সিস বেকন পরিষ্কারভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বা স্বৈরাচারী চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন "সত্যিকার বিজ্ঞান তা–ই যা পৃথিবীতে মানুষের শক্তিমত্তা বাড়িয়ে তোলে"–এই কথা বলে, যেখানে কান্ট বলছেন "সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যহীন উপযোগিতা"র কথা।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ভাবনা যত জটিল ও গভীরই হোক না কেন, একে কখনোই ভাষার সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয়নি। কিন্তু শিল্পকে তার পারমার্থিক চরিত্রের কারণে ভাষার চলতি অর্থ ছাড়াও অন্যতর অর্থ খুঁজতে হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে বলতে হয় শব্দ ও বর্ণ বিজ্ঞানের শক্তিশালী প্রকাশযন্ত্র যা মানুষের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে চলেছে। লেখালেখি ভাষার সাথে, ভাষা চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত এবং এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কঠিন যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা। ফলত আত্মার খণ্ডতম তৎপরতার প্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থ এই ভাষা। বেতোফেনের 'নবম সিম্ফনী' পুনর্ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, আবার 'হ্যামলেট'কেও বিজ্ঞানের ভাষায় বা মনস্তত্ত্ব ও নীতিবিদ্যক প্রশ্নে সীমিত করা যায় না। শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি তাই স্বভাবতই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

'কিং লিয়ার' মঞ্চস্থ করার সময় পিটার ব্রুক একে বললেন "এক পর্বতচূড়া যেখানে পৌঁছানো যাবে না কখনোই।" পরমার্থ তথা শিল্পনির্যাসকে পেতে হলে ভাষার চলতি অর্থকে সরিয়ে রাখতে হবে। জেমস জয়েসের লেখায় বিশেষত তাঁর 'Ulysses'-এ শব্দের খেয়ালী খেলা দেখতে পাই। একই চিত্র কুরআনের অনেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে পাওয়া যাবে।

বাস্তববাদ মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা অতিব্যক্তিবাদ ও পরাবাস্তববাদের চেয়ে সহজে বোধগম্য– বহুল প্রচলিত এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়, যদি শিল্পের অন্তঃসারকে স্মরণে রাখি। 'মোনালিসা' পিকাসোর 'Maidens from Avignon' (যা কিনা ইওরোপে কিউবিজম–এর সূত্রপাত ঘটায়) এর চেয়ে কম রহস্যময় নয়। শিল্পের সারসত্য আসলে ধর্মানুভব কিংবা অন্তর্গত স্বাধীনতার ধারণার মতই অনধিগম্য। স্বভাবতই যৌক্তিক–বৌদ্ধিক উপায়ে শিল্পতল স্পর্শ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শিল্প ও ধর্ম

অনেকেই বিশ্বাস করেন, কাফকার উপন্যাসকে বোঝা যেতে পারে শুধু ধর্মীয় রূপক হিসেবে। কাফকা নিজেও বলেছেন, তিনি তাঁর চিন্তা–ভাবনা ও জিজ্ঞাসাগুলোকে এক ধরনের প্রার্থনা হিসেবে দেখেছেন। "এ বিশ্বজগৎ অসংখ্য প্রতীকে পরিপূর্ণ যা আমরা বুঝতে পারিনে"– বলছেন তিনি। সুপরিচিত পরাবাস্তববাদী মিশেল লিরিস বলছেন, "আমি খোদা কিংবা পরকাল– কোন কিছুতেই বিশ্বাস করিনে। কিন্তু আনন্দ সহকারে এ্যাবসলুটের কথা বলেছি, আমি আশা করেছি যে, কাব্যিক যাদুময়তা সব কিছুর পরিবর্তন ঘটাবে এবং আমি জীবন্তভাবে শাশ্বতে প্রবেশ করব, শব্দের করিডোর দিয়ে আমি মানুষ হিসেবে আমার বিধিকে অতিক্রম করে যাব।" (The Age of Man)

www.pathagar.com

এই বক্তব্য শেষ পর্যন্ত ধর্মগন্ধ দ্বারা আপ্লুত হচ্ছে। কারণ নৈতিকতা যুক্ত কল্যাণ ও স্বাধীনতার সাথে, শিল্প যুক্ত মানুষ ও সৃষ্টির সাথে এবং এ্যাবসলুট যুক্ত ধর্মের সাথে এবং এ সব কিছু একই পুঞ্জীভূত মানবিক আকাঙ্ক্ষার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

ধর্মের সাথে শিল্পের সখ্য শুরুসূত্রেই। বিষয়গত ও ঐতিহাসিক–উভয় দৃষ্টিকোণই নাটকের ধর্মীয় উৎপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২] মন্দিরগুলোই প্রথম মঞ্চ। চার হাজার বছর আগে অভিনীত পৃথিবীর প্রথম নাটকটি ছিল এক ধর্মাচার। প্রাচীন গ্রীক নাটকের উৎপত্তি দেবী দিওনিসাসের প্রশংসাসূচক দলীয় সঙ্গীত থেকে। ধর্মতত্ত্ব নয়, নাটকের মাধ্যমেই মানুষের সত্যিকার ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে।

আদিকালে চিত্রকর্ম, মূর্তি, নাচ, গান ধর্মানুসারী ছিল। পরবর্তীতে তা পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে। আদিম 'বন্য' মানুষ কোন পশু শিকারের আগে গুহাগাত্রে উক্ত পশুর ছবি আঁকত–এটা সফলতার শৈল্পিক প্রার্থনা। ইন্ডিয়ানরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বহরঙা সংকেত এঁকে রাখত বালুর ওপরে। জাপানিদের বিশ্বাস অনুযায়ী পুরনো জাপানি ব্যালে নাচের অস্তিত্ব এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে। প্রাক ইসলামী আরবে কবিদেরকে জন্মমৃত্যুর ওপর প্রভাবশীল মনে করা হত এবং যাদুকর হিসেবে শ্রদ্ধা করা হত।[৩] গ্যাবরিয়েল যায়দা মেক্সিকোবাসী ইন্ডিয়ানদের কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন যার ভূমিকায় তিনি বলেন যে, এদের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল শাশ্বত জীবনের প্রতীকীকরণ।[৪] শিল্প ও ধর্মের মধ্যকার ঐক্যকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যেতে পারে বাইবেলের "Song of Songs" নামক সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও উচ্চ শিল্পমানসম্পন্ন হেঁয়ালী (riddle) থেকে। মোটেও আশ্চর্য নয়, "Song of Songs" ধর্মপুস্তকে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা স্বতন্ত্ররূপে ধরা পড়েছে বাইবেলের বিজ্ঞ ব্যাখ্যাদাতাদের নিকট। সরল বিশ্বাসীদের নিকট অন্যান্য ধর্মীয় বিষয় এবং এই শৈল্পিক হেঁয়ালীখণ্ডের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়েনি।

বিজ্ঞান যেমন জ্যোতির্বিদ্যার মানসকন্যা (বার্গসোঁ), তেমনি শিল্প ধর্মের মানসকন্যা। শিল্প তার সংকটকালে যদি উত্তরণ চায় তাহলে তাকে তার নিজস্ব উৎসে ফিরে যেতে হয় এবং শিল্প তা করেও বটে।

সকল সংস্কৃতিতে স্থাপত্যকলা তার মহত্তম অনুপ্রেরণা কাজে লাগিয়েছে উপাসনালয় নির্মাণে। প্রাচীন ভারত ও কম্বোডিয়ার মন্দির, মুসলিম বিশ্বের মসজিদ, আমিকারপূর্ব আমেরিকার জঙ্গলে নির্মিত মন্দির এবং আজকের ইওরোপ–আমেরিকা জুড়ে গীর্জা ও চ্যাপেল–এগুলো নির্মাণে ছাপ রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতার। বিশ শতকের প্রথিতযশা নির্মাণশিল্পীরা এক্ষেত্রে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতে পারেন নি। ফ্রাঙ্ক লয়েড রীড, আলভার আলতো, ফিলিপ জনসন, রুডলফ লানডি, অস্কার নিমেয়ার, ইউয়ার তরোজা, ফেলিক্স

www.pathagar.com

ক্যানডেলা প্রমুখ স্থাপত্য নায়কেরা এই শতাব্দির চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে পেনসিলভানিয়া (Beth Sholom Synagogue), নিউ ইয়র্ক (Temple Knesset Israel), স্টামফোর্ড (First Presbyterian Church), ফ্লোরিডা (Lutheran Church of St. Paul), ফ্রান্স (Le Corbusier-Notre Dame due Hant), ফিনল্যান্ড (a Lutheran Church), ব্রাজিল (Church of St. Francis), মেক্সিকো (Church La Virgen) প্রভৃতি স্থানে তাঁদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তুমুল অনুভাবনা সহকারে।

শিল্প ধর্মের প্রতি তার ঋণ শোধ করে যাচ্ছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমেও। রেনেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলো কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সারা ইওরোপ জুড়ে গীর্জা কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। ইতালি কিংবা নেদারল্যান্ডে এমন কোন গীর্জা নেই যা একাধারে শিল্পগ্যালারিও নয়। মিকেল্যাঞ্জোলোর শিল্পকর্ম ও ভাস্কর্য খ্রিষ্টবাদের বিশেষ ধারার প্রতিনিধিত্ব করে, যাকে বলা হয়েছে "The Gospel in Paint and Stone", এদিকে বিশ শতকের দুই শ্রেষ্ঠতম কম্পোজার Debussy ও Stravinsky তাঁদের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন ধর্মীয় বিষয়কে লগ্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমজনের "The Martyrdom of St. Sebastian" এবং দ্বিতীয় জনের "Symphony of Psalms", "Canticum Sacrum" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। হান্ডেলের "Saul" ও "Samson and The Messiah" একই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

শেগাল তাঁর পনেরটি বড় মাপের ক্যানভাস সাজিয়েছেন বাইবেলীয় বিষয়বস্তু দ্বারা। কেনেথ্ ক্লার্ক রেমব্রান্ডট সম্পর্কে বলছেন, "তাঁর হৃদয় বাইবেলের ভাবস্রোতে স্নাত; তিনি বাইবেলের প্রতিটি কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতেন।—তাঁর ড্রইংগুলো দেখে অনেকেই বুঝতে পারেন না তা কোন পর্যবেক্ষণের দলিল নাকি ধর্মকাহিনীর নির্যাসের চিত্রায়ন।"[৫] ইভস ক্লেইন তাঁর শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পান বৌদ্ধ ধর্ম ও বার্গসোঁ–এর স্বজ্ঞাবাদী দর্শনের ব্যাপক পড়াশুনোর মধ্যে। তাঁর কাছে শিল্প হল ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি তাঁর সবচে দুঃসাহসিক চিত্রকর্ম "Cosmogony" তৈরি করেন বৃষ্টি ও বাতাসের সাহায্যে।

শিল্প আমাদেরকে যা বলে এবং যেভাবে বলে তা ধর্মীয় বাণীর মতই অবিশ্বাস্য–অনিন্দ্য মনে হয়। একটি পুরনো জাপানি দেয়ালচিত্রের দিকে দেখুন, দেখুন আলহামরার আঙ্গনা, মেলানেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে সংগৃহীত মুখোশ, উগান্ডার লোকনৃত্য, মিকেল্যাঞ্জেলোর 'লাস্ট জাজমেন্ট', পিকাসোর 'গুয়ের্নিকা' কিংবা শুনুন 'মারটারডোম অব সেন্ট সেবাস্তিয়ান' অথবা নিগ্রো আধ্যাত্মিক সঙ্গীত–তাহলে আপনার যে অভিজ্ঞতা হবে তা যুক্তি দিয়ে বোঝা যাবে না এবং আপনার মধ্যে উজ্জীবিত অনুভূতিকে মনে হবে প্রশান্তিময় প্রার্থনার মতই। সিক্কনী যেমন সুরধ্বনিক স্মৃতিচারণ, চিত্রকর্মও তেমনি ক্যানভাসের ওপরে ধর্মাচ'রণ।

www.pathagar.com

শিল্প মূলত সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়। এ্যাজটেক কিংবা আইভরিকোস্টের মুখোশ কিংবা গিয়াকমেত্তির ছোট্ট চক্ষুহীন মূর্তিটিকে সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু তারা সত্য সন্ধানের পথে এক একটি বিপ্লব।

মধ্যযুগে শিল্পীরা চার্চের নিরঙ্কুশ প্রভাব দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; কিন্তু বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপরীতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়; সংকটাপন্ন হয় শিল্প। মধ্যযুগের শেষ পাদে যখন বিজ্ঞানকে দমন ও উৎখাত করার জোর তৎপরতা চলেছে তখন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পগোষ্ঠী তাঁদের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মগুলোর সৃজন সম্পন্ন করেন। স্টালিনের যুগে সোভিয়েত বিজ্ঞান আনবিক শক্তি ও নভোবিজ্ঞানে দারুণ উন্নতি সাধন করে, কিন্তু শিল্প তার পরাজাগতিক চারিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে কঠিন চাপ বহন করতে থাকে। একদিন চার্চ বিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্বের সেবক বানাতে চেয়েছিল, আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন চাইছে শিল্পকে রাজনীতির সেবাদাস বানাতে। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিবাদ কখনো শিল্পের মৌলিক প্রবণতাকে অনুধাবন করতে পারে না, ধর্মও কখনো বিজ্ঞানকে বুঝতে পারে না। পিকাসো সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারেন, পিকাসোর শৈল্পিক অভিজ্ঞান নয়। শিল্পীর সচেতন মতামত ও আকাঙ্ক্ষা যা-ই হোক না কেন, তাতে শিল্পের কিছু এসে যায় না। সে তার সহজাত চেহারা নিয়ে নিজেতেই নিজে ভাস্বর থাকবে। দস্তয়েভস্কির খ্রিস্টান উপন্যাস যে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল, চিত্রশিল্পী মার্ক শেগাল, পাস্তারনাক ও সোলঝেনেৎসিনের ক্ষেত্রেও একই ট্র্যাজেডি কাজ করেছে।

চার্চের নামে যেমন বিজ্ঞানী ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখকে অবদমন করা হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় নাস্তিবাদের নামে শিল্পী ও ভাবুকদের সেই আচরণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ এক ঐতিহাসিক প্রতিঘাত।

মানব মুখের রাজত্ব

শিল্প ব্যক্তি চরিত্রের সমস্যা দ্বারা আবিষ্ট। 'ওয়ার এন্ড পীস'-এ পাঁচ শ' ঊনত্রিশটি চরিত্র এবং 'ডিভাইন কমেডি' অগণিত ব্যক্তি মুখের সুনির্মিত জগত-এদের প্রত্যেকেই এক একটি আত্মা এবং তার পাপ ও দায়ভার সহকারে অস্তিত্বশীল। সিসটিন চ্যাপেলের দেয়াল ব্যক্তিত্বায়িত মুখের গ্যালারী যেন। মন ও বস্তু, গুণ ও সংখ্যা, চেতনা ও জাড্য এবং ড্রামা ও ইউটোপিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক, চরিত্র ও প্রকৃতির মধ্যে সেই সম্পর্ক। প্রকৃতির অর্থ হল সমরূপতা, সমজাতীয়তা, কার্যকারণ, অভিন্নতা ইত্যাদি; চরিত্র হল ব্যক্তিত্ব, স্বতঃস্ফূর্ততা, মুক্তি ও বিস্ময় বিহ্বলতার ধারক।

www.pathagar.com

ধর্ম আত্মার কথা বলে, শিল্প বলে চরিত্রের কথা এবং তা একই ভাবনাবিন্দুর দুটি প্রকাশ প্রক্রিয়ামাত্র। ধর্ম আত্মায় আপতিত হয়, শিল্প সেখানে পৌঁছাতে চায়, তাকে আমাদের চোখের পর্দায় তুলে ধরতে চায়। শিল্প সব সময় এই আত্মাকেই খুঁজতে চেয়েছে মানব মুখের আড়ালে। আদিম শিল্পকর্মের সবচে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুখমণ্ডল, যেখানে দেহ এসেছে শুধু সাহায্যকারীর ভূমিকায়। জেরিহনে প্রাগ খ্রিস্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগেকার ভাস্কর্য-মস্তক ইঙ্গিত দেয় যে, নবপোলীয় মানুষ মাথাকে আত্মার বাসস্থান বলে মনে করত। ইস্টার দ্বীপের পাথরের মূর্তি নির্মাতাদের মনোযোগ ছিল শুধু মুখমণ্ডলে। ফিদিয়াস ও প্রাক্‌তিসেল থেকে রাফায়েল, মিকেল্যাঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি পর্যন্ত সকল মহান শিল্পী একটি অনন্য বিষয়বস্তুতে আবিষ্ট ছিলেন-মানুষের মুখ ও তার অন্তর্জগত। মোনালিসার তাৎপর্য এখানেই। আমেরিকার গত দশ বছরের শিল্পধারা লক্ষ্য করে কেউ কেউ তাঁকে বলছেন, "a return to the drama of human face."

কাজেই শিল্পকর্ম মূলত ব্যক্তিক তৎপরতা, সমাজনীতি বা রাজনীতি নয়। প্লট কিংবা ঘটনাপরম্পরা সামাজিক হতে পারে, কিন্তু শিল্প সব সময় সমস্যার নৈতিক দিকটির সাথে সম্পর্কিত। রুবেনস-এর শিল্পকর্মের বাহ্য চরিত্র দেখে অনেকে তাঁকে বলছেন "শরীরের শিল্পী", কিন্তু যিনি ব্যক্তির ছবি আঁকেন, তিনি আত্মাও আঁকেন। এদিকে জন্মলগ্নেই ধর্মসংশ্লিষ্টতার কারণে নাটকের লক্ষ্য হল মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সাথে বাহ্য পৃথিবীর সম্বন্ধ স্থাপন করা। "সেক্সপিয়ারের নাটকে আমরা ক্রিয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নই, বরং উৎসাহী এর চরিত্রসমূহের অভিপ্রায়, প্রেষণা ও লুক্কায়িত আত্মার প্রতি যা এমন কি বিকৃতি ও ভ্রষ্টাচার সহযোগেও অত্যন্ত জীবন্ত মনে হয় এবং চরিত্রের পাপাচারটি গৌণ হয়ে ওঠে।"-বলছেন চার্লস ল্যাম্ব। ইউজিন ও' নীল ঠিক এ ধারণায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলছেন, "ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন নেই, চরিত্রগুলোই যথেষ্ট।"

চরিত্র নৈর্ব্যক্তিক নয়, শিল্পে তার অস্তিত্ব "আমি ও তুমি" হিসেবে।[৬] ব্যাপারটি "শিল্পস্রষ্টা" ও ভোক্তার মধ্যকার পার্থক্যকে ক্ষীণ করার প্রবণতাকেই তুলে ধরে। আফ্রিকার কোন গ্রামে যখন নৃত্যদল নাচতে শুরু করে তখন দর্শকরাও তাদের সাথে যোগ দেয়; শেষ পর্যন্ত কোন দর্শকই অবশিষ্ট থাকে না। শিল্পস্রষ্টা ও শিল্পভোক্তার মিলনের মধ্য দিয়ে শিল্পের সার্থকতা ফুটে ওঠে।

বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও দর্শনের তথাকথিত "নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা" শিল্পের ক্ষেত্রে মিথ্যে। শিল্পের নিকট একমাত্র বাস্তবতা হল মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আকুতি। এর বাইরে যা কিছু তা টেকনিক মাত্র।

শিল্পের এই আত্মা (Soul) বা আত্মিক প্রবণতা বিজ্ঞানের মন (Psyche) বা মনস্তত্ত্ব

www.pathagar.com

নয়। শিল্পের আলোচ্য হল সত্যিকারের আত্মা–'রুহ', মানবিক মর্যাদা ও দায়িত্বের ভারবাহক।[৭] এ সেই আত্মা যার কথা সকল ধর্ম, ধর্মপ্রচারক ও কবিগণ বলে গেছেন। এখানে (কোরআন ৩২:৯)
জাং (Jung)–এর "Psychological Types" এবং দস্তয়েভস্কির "Crime and Punishment"–এর চরিত্রের মধ্যেকার পার্থক্যকে স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে প্রথমগুলো বিকৃতগঠন ও কৃত্রিম, অপরগুলো সত্যিকারের মানুষ, পাপ ও স্বাধীনতার মঞ্চে ক্রিয়ারত খোদার সৃষ্টি তথা মানব চরিত্র।

শিল্পী ও শিল্পকর্ম

বাহ্যবস্তু হিসেবে একটি শিল্পকর্মের উপস্থাপনাই শিল্পের আদি উদ্দেশ্য নয়। শিল্পের উদ্দেশ্য স্বয়ং সৃজনভাবনাটি, শিল্পকর্মটি যার অব্যবহিত উপজাত (By product) মাত্র। শিল্পের সার হল অভীপ্সা–ইচ্ছা এবং তা আত্মামন্থিত, বাহ্যজাগতিক নয়। শিল্প তার প্রকৃতিকে একটি শিল্পকর্ম ব্যতিরেকেও ধারণ করতে পারে। যেমন শিল্পী Pollock আঁকতেন একটি ক্যানভাসের ওপর হাঁটাহাঁটি করে কিংবা রঙের টিউবগুলো একটি ক্যানভাসে বিছিয়ে দিয়ে। রুজেনবার্গ এ প্রক্রিয়ায় নতুনতর অভিব্যক্তি আনেন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ সাদা ও শূন্য ক্যানভাস ব্যবহার করে। ইভস্ ক্লেইন ১৯৫৪ সালে মাদ্রিদে প্রকাশ করেন দশ মনোক্রম কাগজের একটি অঙ্কনশূন্য বই। মার্কিন পিয়ানোবাদক জন কেইজ তাঁর "চার মিনিট এবং তেত্রিশ সেকেন্ড" শিরোনামযুক্ত কম্পোজিশনটিতে পিয়ানোর সামনে নিশ্চুপ উক্ত সময়পর্ব বসে কাটান। হ্যামলেটে 'inactivity full of action'ও একই ব্যাপার অথবা আলেকজান্ডার চেকভের নাটকের সেই বহুল পরিচিত ক্রিয়াহীনতা ঃ যেখানে নাটকের কোন কোন দৃশ্য শুধু নীরবতাকে ধারণ করে; মঞ্চে কিছুই ঘটে না, কিন্তু নাটক এগিয়ে চলে, ঘটনা ঘটে অন্তঃস্থ মঞ্চে। কেননা প্রত্যাশা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, লজ্জা, নিরাশা ইত্যাদি কোন ঘটনা নয়, তা অভিজ্ঞতা। নহ্ নামক জাপানি নাটকে এমন দৃশ্য আছে যেখানে অভিনেতা কুড়ি মিনিট পর্যন্ত কোন নড়াচড়াই করে না। ঐ সময়টিতে সে তার আত্মগত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে যায় নিঃশব্দে।

এখানে অন্তর্নিহিতভাবে শিল্পগত দুর্বোধ্যতা থেকে যাচ্ছে–যা জোর দিচ্ছে আন্তরিক ও মন্ময় ভাবনার ওপর এবং বাদ দিচ্ছে বাহ্যিক ও তন্ময় ভাবনাকে।

সাধারণ আঙ্গিকের একটি মনোক্রম ক্যানভাসকে বোঝা যেতে পারে বাহ্য পৃথিবীর প্রতি চূড়ান্ত অস্বীকৃতিরূপে, যে অস্বীকৃতি অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা যেত না। স্বয়ং সৃজন ক্রিয়ার বিমূর্ত কাঁচামালটিই শিল্পের প্রকৃত বোধ ধারণ করে, ছবিটা নয়। ফলত শিল্পীর অভীপ্সা বা তার উদ্দেশ্যটিই সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের যাচায়ন বা স্বীকৃতির মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে একটি বাইসাইকেলের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ পিকাসোর হাতে একত্র ও তাঁর স্বাক্ষর দ্বারা

www.pathagar.com

স্বীকৃত হওয়ার পর তা-ই একটি শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এ পর্যায়ে নৈতিকতা, শিল্প ও ধর্ম আবার একত্র হচ্ছে ঃ "পূর্ব পশ্চিমে তোমার মুখ ফেরানোই খোদা ভক্তি নয়।"[৮]; উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা-ই মানব অভিব্যক্তির অত্রাসযোগ্য মূল্যমানতা। শিল্পসৃষ্টি হল সেই কর্মকাণ্ডটি, যেমনটি নৈতিকতা তা-ই যা আপাতদৃষ্টিতে 'ব্যর্থ'-এরকম আত্মত্যাগেও মূল্য আরোপ করে। আমরা যদি শিল্প, নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে সকল বাহুল্য অপসারণ করে তাদেরকে তাদের সারধর্মে সন্নিহিত করতে পারি তাহলে তাদের সত্যসূচি হিসেবে আমরা পাব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও স্বাধীনতার সুর। এভাবে ধর্ম, নৈতিকতা ও শিল্পের রয়েছে এক সুনির্ধারিত বিশুদ্ধসার।

পুনঃপ্রযোজনযোগ্য শিল্পকর্ম দ্বিতীয় শিল্পী ব্যক্তিত্ব দ্বারা নতুনরূপে প্রকাশিত হতে পারে। আর্থার রুবিনসন বলছেন, যদিও তিনি বেতোফেনের 'ফোর্থ সিম্ফনী' বাজিয়েছেন বহুবার, কখনোই তা পূর্বাপর এক রকম হয়নি। এদিকে মেয়ারহোল্ড এমন এক স্থায়ী মঞ্চের প্রস্তাব করেছেন যেখানে শুধু একটি নাটক-'হ্যামলেট'-মঞ্চস্থ হবে। বিভিন্ন পরিচালক এটা পরিচালনা করবেন, ফলত প্রতিবারই একটি নতুন নাটক উঠে আসবে। কারণ শিল্প শিল্পকর্মের মধ্যে যতটুকু থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে শিল্পীর অন্তরাত্মা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এই ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতারই অপর নাম। ফলাফলঃ দর্শকশ্রোতা ও সংশ্লিষ্ট শিল্পী উভয়ই প্রতিবার উপভোগ করেন একটি নতুন শিল্পকর্ম।

আমরা যখন কোন শিল্পকর্ম বিষয়ে কথা বলি তখন প্রকৃতপক্ষে কথা বলি এর রচয়িতা সম্পর্কে। পিকাসো বলেন যে, সেজানের চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্ময়াভিভূত হতেন অঙ্কনের সময় শিল্পীর উদ্দীপনা ও আনন্দকে উপলব্ধি করে। পিকাসো বলেন, "শিল্পী কি আঁকেন, সেটা ব্যাপার নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল স্বয়ং শিল্পী।" তাঁর মতে একটি শিল্পকর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয় শুধু শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হিসেবে; এটা এমন কি তাঁর নৈতিক জীবনকেও প্রতিফলিত করে। বরিস পাস্তারনাক বলছেন যে, একজন অসৎ মানুষ কখনো মহৎ কবি হতে পারে না। স্বয়ং শিল্পীই শিল্পকর্ম। সেজন্যে আমরা প্রায়শ শিল্পকর্ম চিহ্নিত করি শিল্পীর নামে, শিল্পকর্মের নামকরণ থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি "The Night Watch" না বলে বলি Rembrandt তাহলে ঐ চিত্রকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়ে যায়। এটা সারবস্তু, বাকিটুকু উদ্বৃত্ত।

শিল্প আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যজগতের বাসিন্দা, ঘটনাবহুল বাহ্য জগতের নয়। সে কারণে আমরা সত্যিকার শিল্প ও মিথ্যে শিল্প অথবা অনুপ্রাণিত ও হুকুমতামিল কবিতার মধ্যে রেখা টানতে পারি। একটি শিল্পকর্ম বা এর আঙ্গিকটি সত্য না মিথ্যে তা আলোচ্য শিল্পকর্ম থেকে নির্ধারণ করা যায় না। শুধু পৃথিবীর প্রতি এবং তাঁর নিজের কর্মের প্রতি

www.pathagar.com

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিই তার শিল্পকর্মটিকে সত্য বা মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে পারে। আঙ্গিক বা রীতি যা-ই হোক না কেন, একাডেমিসিজম, পুনরাবৃত্তি এগুলো মিথ্যে। এ ধরনের শিল্পকর্ম সত্যপ্রেরণা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। জাঁ ক্যাসাও-এর ভাষায় "যে কোন একাডেমিসিজম-এর অর্থ মুমূর্ষুতা"। একজন অ-আন্তরিক শিল্পী পৃথিবীতে তার শিল্পকর্মকে মৃত সন্তান হিসেবে প্রসব করেন। এ প্রসঙ্গে প্রার্থনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। উদ্দীপনা ও মনোযোগ ছাড়া প্রার্থনা অর্থহীন। শিল্পে একাডেমিসিজম কপটতা বা ভণ্ডামি, যেমনটি ধর্মে আড়ম্বরতা ভণ্ডামি।

আত্মার আন্দোলন হিসেবে শিল্পের যে প্রাথমিক গুরুত্ব এবং বাহ্য পৃথিবীর ঘটনা হিসেবে শিল্পের যে পরবর্তী গুরুত্ব তা প্রকাশিত হয় অধিকাংশ সময়ে সম্পূর্ণ অবোধগম্য শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। "একটি শিল্পকর্ম প্রধানত একটি অন্তর্গত সঙ্কট, একটি গোপনীয় ব্যাপার, একটি বিশ্বাসঘটিত সমস্যা"-বলছেন ফরাসি ভাস্কর এ্যাডাম। শিল্প এক ধরনের আত্মস্বীকারোক্তি যা অন্যের নিকট আংশিক বোধগম্য মাত্র। "শুধু একজনই আমার শিল্পকর্ম বুঝতে পারে এবং সে হল আমি।"-বলেন ডি চিরিকো-একজন নেতৃস্থানীয় ইতালীয় চিত্রকর। একদিক থেকে সকল চিত্রকর্মই আত্মজৈবনিক। ইগনোজিও সিলোনী বলেন, "যদিও আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু লিখি না, আমার উপন্যাসের সকল চরিত্রে আমার নিজ জীবনের ছোঁয়া রয়েছে।"

কবিতাও একটি স্বগত শিল্প, শুধু কবি ও তার জগত থেকে উৎসারিত। আলবার্তো গিয়াকমেত্তি আমাদেরকে তাঁর ছোট্ট চক্ষুহীন মূর্তির মাধ্যমে কি বোঝাতে চান? "শিল্প একটি অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, অসম্ভবের মধ্যে বিচরণা এবং জীবনের আগুন, সারসত্য ও মনোরত্নকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা"-এই কথা বলে তিনি চেষ্টা করেছেন এ প্রশ্নের উত্তর দানের। এই ব্যর্থ অনুসন্ধানে ও এই অসম্ভব কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক মানুষ নিঃসঙ্গ এবং প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব পথ অনুসরণ করেন। সুতরাং কবিতা, ছবি বা ভাস্কর্য বিষয়ে শিল্পভোক্তাদের দুর্বোধ্যতা বিষয়ক যে অভিযোগ তা তাদের আলোচ্য শিল্পের সারবত্তাকে না বোঝারই ফলশ্রুতি।

সুতরাং সৃষ্টি বিধায়নই শিল্পের সত্যিকার লক্ষ্য যেখানে শিল্পকর্মটি তাঁর উপনির্যাস বহন করে। সৃজনক্রিয়া সম্পাদনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তগুলোতেই শিল্প সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তী শিল্পকর্মে এই আনন্দ ও সম্পূর্ণতার একটি অংশ থাকে মাত্র। একটি শিল্পকর্ম হল আত্মার চুল্লিতে ঘটা এক অগ্নিকাণ্ডের ফল, সেই আগুনটি নয়। অন্যকথায় তা বরং সৃষ্টীয় অগ্নিকাণ্ড-পরবর্তী অবশিষ্টাংশ।

www.pathagar.com

সমালোচনা একটি শিল্পকর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা, কিন্তু যৌক্তিক–বৌদ্ধিক পদ্ধতি গ্রহণ করায় শিল্পকর্মের সঠিক মূল্যায়ন সমালোচনার দ্বারা সম্ভব হয় না। সমালোচক এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করতে চান যা মূলত চিন্তার ফলশ্রুতি নয়।[৯] একজন শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পকর্ম হল যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে উৎসারিত গভীর অন্তর্দর্শন, তা কোন বিশ্লেষণ বা যৌক্তিক অবধারণের ফলাফল নয়, বরং তা পিকাসোর ভাষায় "যন্ত্রণা ও বেদনার মানসকন্যা"। সে কারণে সমালোচকরা শিল্পকর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মর্মকেন্দ্রে আলোর ফেলার চেয়ে বিশৃংখলা নিবেদন করেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। "সমালোচক শিল্পকর্মকে খুন করেন"–কাফকার একটি বই পড়ে আইনস্টাইন এই মন্তব্য করেন এবং টমাস মান–এর নিকট লেখেন, "আমি এটা পড়তেই পারিনি; কাফকাকে বোঝার মত জটিল মনোবৃত্তি কোন মানুষের নেই।" কিন্তু সমালোচকরা স্বয়ং কাফকাকেই যেন ছাড়িয়ে গিয়েছিল উৎকর্ষে। আলফ্রেড ক্যাসিনো লিখছেন, কাফকার ব্যাখ্যাদাতাদের চেয়ে কাফকাকে বোঝা সহজতর। এদিকে দস্তয়েভস্কি তাঁর পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছিলেন, কিন্তু হেনস্থ হয়েছিলেন তাঁর সমালোচক ও ব্যাখ্যাদাতাদের নিকট। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন (১৮৭৬), "আমার সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রেরণা এসেছে সব সময়ই আমার পাঠকের নিকট থেকে, আমার সমালোচকের নিকট থেকে নয়।"

শিল্পের প্রয়োজন অবিশ্লেষক ভোক্তা। জটিল সমালোচক মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠক/দর্শক একটি শিল্পকর্মকে কতক ঘটনা ও নীতির সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করবেন। কিন্তু শিল্পীর মৌল উদ্দেশ্যটি থাকবে অবহেলিত। তাই এই ধারণাটি মিথ্যে নয় যে, পণ্ডিত কিংবা বিদগ্ধ সমালোচকের চেয়ে সাধারণ দর্শক বা পাঠকের নিকটেই একটি শিল্পকর্মের সারসত্যটি সহজে পৌছায়। তারা শিল্পকর্মকে 'বোঝা'র চেষ্টা করেন না, বরং অভিজ্ঞতা ও সংবেদন সহযোগে শিল্পকর্মের ভেতরে যাবার চেষ্টা করেন। একটি কবিতা ও নাটকের মূল্যায়নকালে সাধারণ সমঝদার ও সমালোচকের কাছ থেকে যে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য আসে তা এ কারণেই।

সমালোচনা ও শিল্পকর্ম একত্রগামী নয়, ঠিক যেমনটি ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম এক নয়। ফকনার সমালোচকদের তুলনা করেছেন ধর্মযাজকদের সাথে। নীতির প্রশ্নটি নাটকে, নাট্যমঞ্চে কিংবা উপন্যাসে আসতেই পারে; কিন্তু কিভাবে? বাইবেল ও কুরআন ধর্মতত্ত্ব নয়। খ্রিস্টবাদ অস্তিত্বশীল শুধু যীশু খ্রিস্টের ইতিহাস হিসেবে, তত্ত্ব হিসেবে নয়। যীশু খ্রিস্ট ও গোসপেল খ্রিস্টবাদের একটি দিক; পল ও চার্চ আরেকটি দিক।

আমাদের এ আলোচনা শেষ করতে চাই এই ধারণায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে যে, মানবিকতার সন্ধান করতে গিয়ে শিল্প সৃষ্টিকর্তাকেই সন্ধান করতে থাকে। পৃথিবীতে প্রচুর

www.pathagar.com

নাস্তিক শিল্পী আছেন–এ তথ্য এ ব্যাপারটিকে পাল্টাতে পারে না, কারণ শিল্প হল করণ (Way of doing), চিন্তন (Way of thinking) নয়। ধর্মগন্ধহীন ছবি, ভাস্কর্য ও কবিতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ধর্মহীন শিল্পের অস্তিত্ব কোথাও নেই।

টীকা

১. Bryen বলছেন, "চিত্রকর্ম হল ভাষার পরিপূর্ণ অনুপস্থিতি। এখানে তৈরি হয় এক বিশেষ চিত্রজগত যেখানে শিল্পী নিজেকেই সেবা করে থাকেন। এটা নিজস্ব এক জগত, একটি পারমার্থিক পর্যায় যাকে কোন সমালোচক ব্যাখ্যা করতে পারেন না, কেননা তিনি নির্ভরশীল ভাষারওপর।"

২. দ্রষ্টব্য Zvonko Lesic–এর Theory of Drama Throughout the Centuries, Sarajevo, 1977.

৩. Smailagic : Introduction to the Koran, Zagreb, 1975, P. xxvi.

৪. Gabriel Zaida : Omnibus de Poesia Mexicana.

৫. Kenneth Clark : Civilization, London, 1969, P. 203.

৬. Martin Buber : I and You.

৭. The Qur'an 32:9.

৮. The Qur'an 2:177.

৯. Andre Marchand বলছেন : "চিত্রশিল্পী বুদ্ধিজীবী নন। চিত্রকর্মে বুদ্ধিমত্তা জরুরি নয়। এখানে যা প্রয়োজন তা আত্মার মধ্যকার আলোকমাত্রা।

www.pathagar.com

নৈতিকতা

কর্তব্য ও স্বার্থ

যে দুটো ভিন্ন শৃংখলা থেকে সকল বাস্তবতার উৎসারণ, তাদের সার্বিক বিশ্লেষণ এখনও সম্ভব হয়নি। সৃষ্টিধারা তার স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বাধীনতা, চৈতন্য ও ব্যক্তিত্ব সহযোগে একদিকে অবস্থান নিয়েছে; বিবর্তনধারা তার হেতুবাদ, জাড্য, সমরূপতা সহযোগে অবস্থান নিয়েছে আরেক দিকে। কর্তব্য ও স্বার্থ এই দুই ধারায় সমর্পিত। আগেরটি নৈতিকতার কেন্দ্রীয় ধারণা, পরেরটি রাজনীতির সহযাত্রী।

কর্তব্য ও স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হলেও প্রতিটি মানবিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি, কিন্তু তারা কোনভাবেই তুলনাযোগ্য নয়; কর্তব্য সব সময় স্বার্থের উর্ধ্বে, কিন্তু স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই নৈতিকতার সাথে। নৈতিকতা আনুষ্ঠানিকও নয়, যৌক্তিকও নয়। কেউ যদি প্রতিবেশীর শিশুকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আগুনে ঝাঁপ দেন এবং মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসেন তাহলে কি আমরা বলব যে, তাঁর কাজটি অনর্থক, কারণ তিনি বাচ্চাটিকে বাঁচাতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা তা-ই যা এই আপাতব্যর্থ কাজকে মূল্যবান মনে করে। সফলতা বা বিফলতা নয়, একটি শিশুর প্রাণকে রক্ষা করার অন্তর্গত আকুলতাই মুখ্য।

ন্যায় পরাজিত হলেও আমাদের হৃদয়কে জয় করে এবং সাথে সাথে তা অন্যতর জগতের অস্তিত্বের নির্দেশ করে। ন্যায় ও সত্যের খাতিরে সংগ্রাম করতে করতে কারোর মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াটা যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদাতাদের নিকট নিরর্থকতা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের নিকট, যেহেতু প্রকৃতি ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে উদাসীন সেহেতু ন্যায়, সত্য ইত্যাদির জন্যে আত্মদান অর্থহীন। কিন্তু যাঁরা এই আত্মত্যাগকে মূল্যবান মনে করেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে এক পরম পরোক্ষ শক্তির কথা স্মরণে রাখেন। আমরা কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই এই আপাতঅনর্থক কাজকে সর্বান্তকরণে স্বীকৃতি দিই। কাজের মহত্ত্ব সে কাজের সফলতা বা যুক্তিবিচারের মানদণ্ডে বিচার্য নয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহৎ কাজগুলো সফলতাশূন্য ও অযৌক্তিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাঁরা তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, এমন কি জীবন খুইয়েছেন তাদেরকে কিভাবে জয়ী বলা যায়? নিশ্চিতভাবেই তারা এই জগতের বিজয়ী নন। তবু আমরা বলি, তাঁরা বিজয়ী, তাঁরা বেঁচে থাকেন। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, "তাহলে কি এই সীমাবদ্ধ ইহলোকের উর্ধ্বেও মানব অস্তিত্বের ধারা বয়ে চলেছে?"

নীতি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এখানে ধর্ম প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। সেক্ষেত্রে হয় নৈতিকতাকে সংসারের জঞ্জাল হিসেবে পরিত্যাগ করা উচিত নতুবা একে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা উচিত সৃষ্টিকর্তাকে সংলগ্ন করে, তখনই মানুষের নৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থময় হতে পারে; তৃতীয় কোন বিকল্প নেই।

খুব অল্পসংখ্যক মানুষ নৈতিক নীতিমালা অনুসারে কাজ করে থাকেন। কিন্তু এই সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষেরাই মানব জাতির গর্ব। আমাদের কর্তব্যের তাগিদে করা কাজের সংখ্যাও খুব কম, কিন্তু যে বিরল মুহূর্তে আমরা স্বার্থ ও লাভকে জলাঞ্জলি দিয়ে মহত্ত্বের ধারায় জেগে উঠি সে মুহূর্তটিতেই জীবনের শাশ্বতসার উপলব্ধ হয়।

কেউ নৈতিক সত্য কিংবা নৈতিক মিথ্যের ধারক হতে পারেন, কিন্তু কখনোই নৈতিকতানিরপেক্ষ হতে পারেন না। সত্যিকার বীর ও সৎ মানুষেরা সরলতা সহকারে ন্যায় ও সত্যের কথা বলে থাকেন ; আর মঞ্চসফল রাজনীতিকরা ভণ্ডামি ও কপটতার চর্চা করেন নৈতিকতার ঢাল সামনে রেখে। কিন্তু এই ভণ্ড ও পেশাজীবী রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ড আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নৈতিকতার ভান, নৈতিকতার মুখোশ, তাদের সেই পুরনো ন্যায়, সত্য, মানবিকতার বুলি প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতার অস্তিত্বকেই উদ্ভাসিত করে তোলে। রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষত সাম্প্রতিক কালের, ঘাঁটলে দেখা যাবে কিভাবে স্বাধীনতার শত্রুরা একদিকে অত্যাচার, অনাচার, গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যায়, আবার পাশাপাশি সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বাণী বিতরণ করে। বস্তুত 'ছদ্মনৈতিকতা' হিসেবে কপটতা 'আসল নৈতিকতা'র মূল্যকেই প্রমাণ করে, যেমনটি জাল টাকার সাময়িক মূল্য বৈধ টাকার সার্বজনীন ও স্থায়ী মূল্য আছে বলেই।

উদ্দেশ্য ও কর্ম

প্রকৃতি জগতে বস্তু নৈর্ব্যক্তিকভাবে অস্তিত্বশীল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে—ব্যাপারটি পছন্দ করি আর না-ই করি, এর কোন ব্যত্যয় ঘটাতে পারিনে আমরা। বিপরীতক্রমে আমাদের অন্তর্গত জগতে বস্তু নৈর্ব্যক্তিকভাবে অবস্থান করে না। আমাদের চেতনার রঙে তা হয়ে ওঠে চুণি, পান্না। মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সূত্রটিও এখানে মেলে।

বাহ্য জগতে রয়েছে ধনী-দরিদ্র, বুদ্ধিমান-বোকা, জ্ঞানী-মূর্খ, দুর্বল-শক্তিমান। এই চিত্র অনিবার্য সত্যের প্রতিফলক। আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিমত্তা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখানে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু আমাদের অন্তর্জগত সমান সুযোগ ও সমান স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি। এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ। কারণ এখানে কোন প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা নেই।

এই স্বাধীনতার প্রকাশ নিয়ত বা উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অন্যায়কে দূরীভূত করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেকেই অন্যায়কে অন্তত অন্তরে ঘৃণা করতে পারেন। নৈতিকতা শুধু নৈতিক কাজের মধ্যে নয়, এটা অনৈতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সৎভাবে

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার আকুতির মধ্যেও নিহিত রয়েছে। মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। পাপ ও অনুতাপই মানবিক। এমনও তো হয় যে, আমরা যে সমস্ত কাজ করতে চাইনি তা করতে হয়, আবার যা করতে চেয়েছি তা কখনোই করতে পারি না। কাজেই দুটো জগত রয়েছে ঃ অন্তর্জগত ও বহির্জগত। আমাদের যে ইচ্ছা বাস্তব জগতে পূরণ হবার নয়, তা হয়ত হৃদয়জগতে পূরণ হয়ে যাচ্ছে। সেখানেই তার বাস্তবতা। আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে যা আমাদের উদ্দেশ্য–ইচ্ছা–আকাঙ্ক্ষার নাগাল থেকে অনেক দূরে, আমাদের অন্তঃস্থ জগতের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই, তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের সংঘটনা।

একটি কর্ম তার উদ্দেশ্য বা নিয়ত দ্বারা বিচার্য হওয়া উচিত–একটি কর্ম তার ফল দ্বারা বিচার্য হওয়া উচিত– প্রথম বাক্যটি সকল ধর্মের প্রস্তাবনা, দ্বিতীয়টি সকল বিপ্লবের মূলমন্ত্র। একটিতে পৃথিবীকে অস্বীকার করার প্রবণতা, অপরটিতে মানুষকে অস্বীকার করার প্রবণতা সুস্পষ্ট।

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদকে অনিবার্যভাবে মানুষের নিয়তের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে হয়েছে। তাদের নিকট নিয়ত অবিশ্লেষ্য ও অবিশ্বাস্য; এমন কিছু যা কোন কারণ নয়, ফল। তাদের নিকট মানবিক কর্মকাণ্ডের উৎস নিয়ত নয়, বরং এমন কিছু যার অবস্থান আত্মজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, সাধারণ অদৃশ্যবাদের জগতে।

অপরদিকে ধর্মানুসারে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক জীবন্ত স্পন্দনকেন্দ্র রয়েছে যা সকল অস্তিত্বের অতল অববাহিকতা, সকল উন্মেষণার আধার– যার নাম আত্মা। নিয়তের অর্থ হল আত্মার কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন। এইভাবে একটি কাজের মানসিকতা গৃহীত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে, অতঃপর আত্মার সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তখন কাজটি বাহ্যিকভাবে সম্পাদন করা না–ও হতে পারে, হতেও পারে, কিন্তু অন্তর্জগতে সে কাজটি উদ্দেশ্য বা নিয়তের রসে সুসম্পন্ন হয়ে যায় ইতোমধ্যেই, চিরদিনের জন্যে। কাজেই নিজের সাথে পরামর্শহীন যে কোন কাজ যান্ত্রিকতা ছাড়া কিছুই নয়।

মানুষ কি করে সেটা নয়, মানুষ কি করতে চায়– সেটাই অধিকতর গুরুত্ববহ। একজন লেখক শুধু তাঁর প্লটেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না ; তিনি তাঁর নায়কের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁর লুকোনো উদ্দেশ্যকে বিবৃত করেন। লেখক যদি তা না করেন তবে তিনি ঘটনাপঞ্জী লিখছেন, সাহিত্যকর্ম নয়।

Arnold Geulinx-এর মতে আমাদের সত্যিকার অস্তিত্ব আত্মজ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্মিত যা কাজকে আমাদের চৈতন্যসীমার মধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার সামর্থ্য দান করে। কার্যফল নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে, তা সম্পূর্ণরূপে খোদার হাতে। কাজেই নৈতিকতার আসল চেহারা আমাদের সৎ কাজের মধ্যে যতটা, তাঁর চেয়ে বেশি সদুদ্দেশ্যের

www.pathagar.com

মধ্যে। ডেভিড হিউমও একই চিন্তা ব্যক্ত করছেন, "কোন কৃত কাজের মধ্যে সে কাজের নৈতিক মূল্য অনুপস্থিত। একজন মানুষকে নৈতিক বিবেচনায় আনতে হলে তার অন্তর্লোকে তাকাতে হবে, কিন্তু যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে সেটা সম্ভব নয়, সেহেতু আমরা দৃষ্টি দিই তার কর্মের দিকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তা ঐ ব্যক্তির অন্তর্গত ইচ্ছার প্রতীক হিসেবে বিরাজিত থাকে মাত্র।"[১]

অন্তরে জেগে ওঠা একটি নিয়ত শাশ্বত ও শর্তমুক্ত। বাহ্য জগতে বাস্তবায়ন কালেই তা জাগতিকতা ও শর্তসাপেক্ষতার অধীন হয়ে পড়ে। মানুষ ভাল, যদি সে ভাল হতে চায়, যদিও এই ভালত্ব কারো কারো নিকট মন্দ মনে হতে পারে। মানুষ মন্দ, যদি সে মন্দ হতে চায়, যদিও এই মন্দত্ব কারো কারো নিকট ভাল বিবেচিত হতে পারে। আসল ব্যাপার স্বয়ং মানুষটি এবং তার জগত। একজন মানুষ যখন তার অন্তর্জগতে প্রবেশ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে একাকী, মুক্ত। সেখানেই তার সোনার কাঠি- রূপোর কাঠি, সেখানেই তার সকল ভালত্ব-মন্দত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা সে রাখে। তাই প্রত্যেক মানুষ চূড়ান্তভাবে তার কর্মের জন্যে দায়ী ; সেজন্যেই সার্ত্রে বলে গেছেন, "there are neither innocent victims nor innocent convicts in hell."

নৈতিকতা ও যুক্তিবুদ্ধি

মানবিক স্বাধীনতার ধারণা ও নীতিভাবনা অচ্ছেদ্য। শত পরিবর্তন সত্ত্বেও নীতিক ইতিহাসের গতিধারায় সংযুক্ত রয়েছে স্বাধীনতার শক্তিমন্ত্র। পদার্থবিদ্যার যেমন স্থান ও সংখ্যা, নীতিবিদ্যার তেমন স্বাধীনতা।[২] যুক্তি স্থান ও সংখ্যাতত্ত্ব ভালই বোঝে কিন্তু স্বাধীনতাকে বুঝতে চায় না। এখানেই যুক্তি ও নীতির মধ্যেকার পার্থক্য।

যুক্তির কাজ হল প্রকৃতি, যান্ত্রিকতা ও গণিততত্ত্ব আবিষ্কার করা, অন্যকথায় নিজেকেই সকল কিছুর মধ্যে খুঁজে ফেরা। সে কারণে যুক্তি সব সময় নিজেতেই নিমজ্জিত- প্রকৃতিতেও সে যুক্তি ছাড়া কিছুই দেখে না। এজন্যে কতক নৈতিক তত্ত্বে যুক্তিবিন্যাসকে গ্রহণ করার ফলে তাদের উপসংহার এ রকম ঃ স্বার্থহীনতা সমান সমান স্বার্থপরতা, আনন্দহীনতা সমান সমান আনন্দ-যা ভলতেয়ারকে তাঁর বিখ্যাত reduction ad absurdum (স্বার্থের কারণেই স্বীয় জীবন উৎসর্গ করা) তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা নৈতিকতার বিশ্লেষণের অর্থ নৈতিকতাকে প্রকৃতি, স্বার্থপরতা ও স্বার্থমূলক নীতিবাদে (egoism) হ্রাস করা। যুক্তি প্রকৃতিতে যেমন আবিষ্কার করে কার্যকারণতত্ত্ব, তেমনি মানুষের মধ্যেও প্রকৃতিকে খুঁজতে চায়-যা মানুষের দাসত্ব ও পরাধীনতার সূচক। একইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেই চিন্তাকে যা খোদাকে হ্রাস করে

www.pathagar.com

'আদি কারণে' (immovable mover), আত্মাকে হ্রাস করে মনস্তত্ত্বে এবং শিল্পকে টেকনিকে। নীতিকে যুক্তির রাজ্যে ধরে আনার চেষ্টা তথাকথিত সামাজিক নৈতিকতারই প্রকল্প বিশেষ যা প্রযোজ্য শুধু কৃত্রিমভাবে গঠিত কোন সমাজ ও তার সদস্যদের ক্ষেত্রে।

যুক্তি যা পারে তা হল বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ককে পরীক্ষণ ও সনাক্তকরণ; কোন কিছুর নৈতিক মূল্য নিরূপণে সে অপারগ। যুক্তি ও প্রকৃতি সঠিক ও ভুল, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না। একজন সৎ মানুষ সর্বদা সুখী এবং একজন অসৎ মানুষ সর্বদা অসুখী–এই বিখ্যাত নৈতিক সূত্র বৌদ্ধিক পদ্ধতিতে বোঝা যাবে না। খ্রিষ্টান নীতিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, এর সকল নৈতিক দাবি একজন ব্যক্তিত্ব থেকে প্রবাহিত–তিনি যীশু খ্রিষ্ট। ফরাসি বিপ্লবের তিন বিখ্যাত মন্ত্র– সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ব–এগুলো বিজ্ঞান থেকে আসতে পারে না। বিজ্ঞান বরং এর স্বভাব অনুযায়ী বিপরীত নীতি প্রতিষ্ঠা করবে– মানুষকে চূড়ান্ত সামাজিক কানুন উপহার দেওয়া ও সমাজকে কতক সুআয়োজিত ইউনিটে বিভক্ত করার মাধ্যমে, যেখানে বিরাজ করবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা।

জাঁ ভালজা[৩] যে নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা কি বিজ্ঞানের আশ্রয়ে সমাধা হতো? একজন সরল ও সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্যে অন্যান্য অনেক মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করা কি উচিত হয়েছে তাঁর? নৈতিকতা বলবে, 'হ্যাঁ।' বিজ্ঞান বলবে, 'না।' কারণ বিজ্ঞান বেছে নিয়েছে তথাকথিত গণস্বার্থের দিকটি। তা একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষের ব্যক্তিগত মর্মবেদনাকে কখনো বুঝতে পারবে না। জাঁ ভালজার সিদ্ধান্তটি যুক্তিবুদ্ধির পরাজয়কে এবং মানুষের তথা নৈতিকতার বিজয়কে নির্দেশ করে। এ বিজয় যুক্তির অনধিগম্য, কিন্তু সকল মানবহৃদয়ের নীরব সম্মতিতে উদ্ভাসিত।

নৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যুক্তিবুদ্ধি কি করতে পারে সে প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলছেন, "মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অপরাধ প্রদত্ত পরিস্থিতিতে একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত কতক উদ্দেশ্য, চিন্তা ও ক্রিয়ার সমন্বয় ছাড়া কিছুই নয়। সেক্ষেত্রে আমরা এই সম্পর্কের প্রকৃতি, কাজটির উৎস প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের আবেগকে কথা বলতে দিই, তাহলে তা সমস্ত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণকে অতিক্রম করে বলে উঠবে যে, কাজটি অন্যায় বা ক্ষতিকর।"

কিংবা

"আমাদের মন শুধু বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকাশ ও উপস্থাপনে সমর্থ। অপরদিকে মূল্যবোধক বিবেচনায় সম্পূর্ণ নতুন চিত্র জেগে ওঠে, যৌক্তিক বিচারে যার ঠিকানা মেলে না। তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে শুধু অনুভূতির সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা।" Hutchinson-এর ভাষায় "নৈতিকতা বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয় ; এরা স্বতঃস্ফূর্ত ও

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিক।'[৪]

বিজ্ঞান ও নীতির মধ্যেকার পার্থক্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও প্রতিফলিত। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানের নিকট টেস্টটিউব শিশুর জন্যে কৃত্রিম প্রজনন কিংবা করুণামৃত্যু (euthansia) স্বাভাবিক। কিন্তু মানব জীবনের মৌল সূত্রকেই বিকৃত করে বলে এগুলো নৈতিকতার নিকট অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে নীতি, ধর্ম ও শিল্প– সকলের একই দৃষ্টিভঙ্গি, যদিও ব্যাখ্যাভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। ধর্ম কৃত্রিম জীবন বা কৃত্রিম মরণ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র সুযোগ্য নির্ধারক হলেন সৃষ্টিকর্তা, মানুষ নয়। নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেহেতু তা মানুষকে নিছক বস্তুতে হ্রাস করে। আর শিল্পীর নিকট জন্ম ও মৃত্যু হল এক ধরনের রহস্য যা রহস্যময় থাকাই বাঞ্ছনীয়। হ্যামলেটের তিনটি সবচে' বিখ্যাত স্বগতোক্তি মৃত্যুর প্রতি উৎসর্গিত ; কিন্তু বিজ্ঞানের নিকট মৃত্যু অতি তুচ্ছ ও অতিপ্রচলিত একটি পদার্থিক–রাসায়নিক ঘটনামাত্র।

বিজ্ঞানের যা কিছু আবিষ্কার সে বিষয়ে বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে সমালোচনা বা বিতর্ক নেই। তাহলে কিভাবে বিজ্ঞান স্বীয় অপব্যবহারকে উপলব্ধি করবে? The French Academy of Moral and Political Science যখন বিবৃতি দেয়, "কৃত্রিম মানব প্রজনন বিবাহ, পরিবার ও সমাজের মৌল ধারার বিরুদ্ধে এক অপরাধ" তখন তা অবৈজ্ঞানিক বিবৃতি।

বায়োলজি মানুষকে প্রগতি দিয়েছে, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে তার মূল্য। স্বাভাবিক যে একনিষ্ঠ খ্রিস্টান, কবি বা শিল্পী, প্রগতি সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন। খ্রিস্টানদের নিকট এটা 'শয়তানী প্রকৃতিবাদ', কবিদের নিকট 'পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার আয়োজন'।[৫]

বিজ্ঞানের উন্নতি যতই আকাশচুম্বী হোক না কেন, নৈতিকতা ও ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন করতে কিংবা জীবনের পাঠশালায় মূল্যবোধের ক্লাস নিতে সক্ষম হবে না কখনো; ধর্মসংযোগহীন বিজ্ঞানের নিকট জীবন অবোধগম্যই থেকে যাবে। ধর্ম অন্যতর জগত বিষয়ক জ্ঞান, নৈতিকতা তারই অর্থবাহক।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অথবা কান্টের দুই থিসিস

যুক্তিপ্রকরণ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, মানুষ ও জীবন তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে। এ প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর মধ্যকার পার্থক্যকেও ব্যাখ্যা করা চলে।

একজন বিজ্ঞানী যা বলেন, যা চিন্তা করেন এবং যা বিশ্বাস করেন তার সবই বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞানীর সামগ্রিক অনুভাবনার একটি অংশমাত্র, যে অংশটি তার যুক্তিবুদ্ধির শ্রেণীকৃত, তুলনামূলক ও জটিল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। এ ক্ষেত্রে যা কিছু

www.pathagar.com

অতিপ্রাকৃতিক, বিজ্ঞান তা প্রত্যাখ্যান করে এবং একনিষ্ঠ থাকে তাতেই যা প্রাকৃতিক কার্যকারণের সাথে যুক্ত। এ কারণে বিজ্ঞানের মুষ্টির মধ্যে শুধু প্রকৃতির মোহন ভুবন, বাদ বাকী সব এর হাতের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে পিছলিয়ে বেরিয়ে যায়; এটাই বিজ্ঞানের সাধারণ সীমাবদ্ধতা।

বিজ্ঞান তার এই সীমাবদ্ধতাকে সহজে মেনে নিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানী, যেহেতু তিনি মানুষ, এই বৃত্তাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে গেছেন। আণবিক বোমা তৈরির সময় বিজ্ঞানী অপেনহেইমারের ভারতীয় দর্শন পাঠের কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা প্রয়োজন ছিল তাঁর আবিষ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত নৈতিক সমস্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে। পরবর্তী জীবনে তিনি আণবিক গবেষণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আইনস্টাইন দস্তয়েভস্কির লেখা, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস 'Brothers Karamazov'–এ ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি বৈজ্ঞানিক হিসেবে নন, একজন মানুষ, একজন ভাবুক ও একজন শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত যিনি উপন্যাসের নায়ক কারামাজভের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিষয়ে উৎসুক ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ফল প্রয়োগের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির উদ্দেশ্য পৃথিবীকে বোঝা, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য পৃথিবীকে জয় করা। সে কারণে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি, একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে ভিন্ন। সাধারণ মানুষের নিকট বিজ্ঞান কতক সংখ্যাবাচক ও যান্ত্রিক প্রকৃতির গবেষণা ফলাফলের সমষ্টি। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর নিকট, যেহেতু তিনিই একক সাধক, বিজ্ঞান একটি অভিজ্ঞতা, একটি প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা, একটি ত্যাগ ও সাধনা–এক কথায় জীবন। তদুপরি বিজ্ঞান তাঁর নিকট জানার আনন্দ এবং উচ্চতর নৈতিকতার আধার। এই আনন্দধারায় অবগাহন করতে করতে বিজ্ঞানী নিজেকে অতিক্রম করে যান, হয়ে পড়েন একজন চিন্তক, একজন দার্শনিক, একজন শিল্পী। এভাবে বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানী জনগণের জন্যে আবিষ্কার করেন একটি জিনিষ, আর নিজের জন্যে 'আবিষ্কার' করেন আরেকটি জিনিষ। বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞানী তথা তাঁর জীবন থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই অর্জন করে শীতল নৈর্ব্যক্তিকতা, তখনই তা মানুষ বা মানবিকতা বিষয়ে উদাসীন এবং অনৈতিক ব্যবহারের শিকার হয়। অধিবিদ্যা ও 'ultimate questions' বিষয়ে নিশ্চুপ থাকার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনগণের মধ্যে নাস্তিবাদী মত তৈরিতে সহযোগিতা করে, কিন্তু স্বভাবতই স্বয়ং বিজ্ঞানীকে এই বৃত্তে আনা সম্ভব হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কান্টের দুই ধরনের দর্শনচিন্তার মধ্যে আমরা যুক্তি ও জীবন অথবা প্রকৃতি ও ইচ্ছাস্বাধীনতার মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের উদাহরণ পাই। প্রথম পর্যায়ে তাঁর 'Critique of Pure Reason'–এ তিনি আবির্ভূত হন একজন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানী হিসেবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে

www.pathagar.com

Critique of Practical Reason'-এ তিনি আবির্ভূত হন একজন মানুষ ও একজন ভাবুক হিসেবে। প্রথম নিবন্ধটি বাস্তবতা বিষয়ক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল ও বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়টি জগত জীবন সম্পর্কিত এবং আত্মার মধ্যে সংক্রমিত এক নিপুণ নিশ্চয়তার অনুভব ও অভিজ্ঞান। অন্যকথায় কান্ট তাঁর প্রথম নিবন্ধে খোদা, অমরতা ও ইচ্ছাস্বাধীনতা বিষয়ে ধর্মীয় ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি তার পুনরুজ্জীবন ঘটান।

কিন্তু কান্টের এই দুই দর্শনচিন্তা পরস্পরকে বাতিল করে দেয়নি। তাদের অবস্থান পাশাপাশি এবং তারা সর্বব্যাপ্ত দ্বৈততারই প্রতিফলন ঘটিয়ে যাচ্ছে।

নৈতিকতা ও ধর্ম

ধর্ম নৈতিকতার মৌল ভিত্তি হলেও ধর্ম ও নৈতিকতা এক জিনিষ নয়। নীতিগতভাবে ধর্ম ছাড়া নৈতিকতা অস্তিত্বহীন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নৈতিকতা ধার্মিকতার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ধরে রাখে যে নিয়ন্ত্রক শক্তি তা অন্যতর জগতের। কাজেই একদিকে যেমন নৈতিকতা ও ধর্ম স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন, আরেক দিকে তাদের মধ্যে রয়েছে আন্তঃনির্ভরতা।

নৈতিকতার জন্ম হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা (Prohibition) দ্বারা এবং আজ অবধি তা নিষেধাজ্ঞাধীন রয়ে গেছে। দশ ধর্মাদেশের (হযরত মুসার মাধ্যমে প্রেরিত মানুষের প্রতি স্রষ্টার দশ আদেশ) আটটিই নিষেধাজ্ঞা। নৈতিকতার এই সংযমী ও নিষেধবাচক প্রকৃতি মানুষের মধ্যকার পশু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের জন্যে। খ্রিস্টান নীতি এখানে পরিষ্কার উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

প্রকৃতির সাথে জীবনের সামঞ্জস্য-এটা নৈতিকতার বিধান নয়, যদিও স্টোয়িক দার্শনিকরা সেভাবেই প্রচার করেছেন। এটা বরং প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনাচরণ।[৬] প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার সীমায় সীমাবদ্ধ মানুষ যেমন মানুষ নয়, যুক্তিবুদ্ধিমান পশুমাত্র, তেমনি প্রকৃতিবদ্ধ নৈতিকতাও নৈতিকতা নয়, বরং উন্নতমানের স্বার্থপরতার এক রূপ।

'অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম'- ডারউইনের এই তত্ত্বে নৈতিকভাবে যারা শ্রেষ্ঠ তারা জয়ী হতে পারে না, যারা দৈহিকভাবে শক্তিশালী তারাই এখানে জয়ী হয়। একজন ডারউইনীয় মানুষ বায়োলজিক্যাল বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত পর্বে তথা অতিমানবে (Superhuman) রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু একটি জিনিষ কখনোই করায়ত্ত করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। সেটা সরল স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলী। এটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই সংযোজন করতে পারেন।

বায়োলজিক্যাল প্রগতির ধারাবাহক হিসেবে সামাজিক প্রগতিরও নৈতিকতা বিষয়ে কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ইংরেজ নীতিবিদ Mandeville প্রশ্ন তুলছেন, "সমাজ ও সভ্যতার

www.pathagar.com

অগ্রযাত্রায় নৈতিকতার কি তাৎপর্য আছে?" উত্তরে তিনি বলছেন, "কিছুই না। এটা এমন কি প্রগতির জন্যে ক্ষতিকারক।"[৭] তাঁর মতে যা কিছুকে পাপপূর্ণ বলে সচরাচর দোষারোপ করা হয়, সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে তারই অবদান উল্লেখযোগ্য, যেহেতু যা মানুষের চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলে তা-ই তার বিকাশ ঘটায় সবচেয়ে বেশি।" অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে, "নৈতিক ও শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত তথাকথিত অশুভই আমাদের সামাজিক হয়ে ওঠার চালিকাশক্তি।"

যদি সকল প্রগতিকে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্বের মধ্যে খোঁজা হয়, যেখানে শক্তিশালী দুর্বলকে ধ্বংস করে, তাহলে নৈতিকতা নিঃসন্দেহে বিপরীতে অবস্থান নেবে। নৈতিকতা সব সময়ই দুর্বলতর ও অসমর্থের রক্ষা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার দাবি জানিয়ে এসেছে। এভাবে প্রকৃতি ও নৈতিকতা প্রথম থেকে পরস্পর মেরুদূরত্বে অবস্থান নিয়েছে। "বিবেক, সহানুভূতি, ক্ষমা-এই সব মানবিক দৈত্যের আধিপত্য থেকে মুক্ত হও। দুর্বলকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের লাশের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাও সামনের দিকে", বলছেন নীটশে।[৮] নীটশের নিকট খ্রিস্টবাদ, বিশেষত খ্রিস্টান নীতিভাবনা উদ্দীপনাময় মানব জাতির দেহে প্রবৃষ্ট জঘন্যতম বিষ।" নীতিবান আর প্রকৃতিসেবীদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হচ্ছে এখানে। এক পক্ষ চায় প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতিকে, বিজ্ঞান থেকে ধর্মকে, বায়োলজিক্যাল ভাবনা থেকে আধ্যাত্মিকতাকে এবং যুয়োলজি থেকে মানবিকতাকে পৃথক করতে ; আরেক পক্ষ চায় ঠিক এর উল্টোটি।

'Fedon' বইয়ে প্লেটো এক খাঁটি নীতিভাবনার ব্যাখ্যা দেন ঃ অল্প সাহস এক ধরনের কাপুরুষতা, হালকা সংযম ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই নামান্তর, খণ্ডিত গুণপনা আসল গুণপনার ছায়ামাত্র। একজন সত্যিকারের সৎ মানুষের আকাঙ্ক্ষা একটিই ঃ বাহ্যিকতার দূরে থেকে আধ্যাত্মিকতার নিকটবর্তী হওয়া। দেহ আত্মার কবরস্থান মাত্র। জাগতিক অস্তিত্বের সাথে একাত্ম হলে আত্মা কখনো তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সত্যিকার জ্ঞান সম্ভব শুধু মৃত্যুর পর। সে কারণে একজন খাঁটি মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত নন ; সৎ ও সরল চিন্তার অর্থ ক্রমাগত মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া।

প্রতিষ্ঠিত অনেক নীতি যুক্তি বিচারে প্রমাণিত হয়নি এবং সেভাবে তা প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। প্লেটো নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের পরিবর্তে অধিবিদ্যক অবধারণায় একনিষ্ঠ থেকেছেন যা তাঁকে ধর্মতত্ত্বনির্ভর নৈতিকতার অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা সকলেই জানেন যে, প্লেটো পূর্ব-অস্তিত্ব বিষয়ে এমন শিক্ষা প্রচার করেন যেখানে প্রতিটি জ্ঞানকে ধরা হয়েছে এক ধরনের "স্মৃতি" হিসেবে। এই শিক্ষা অমরতার ধারণাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে।[৯]

নীতি বিষয়ে প্লেটোর গভীর অনুধ্যান তাঁকে ধর্মীয় অবস্থানে আনয়ন করে।[১০] অপর দুজন প্রাচীন চিন্তাবিদ এপিকটেটাস ও সেনেকা, একটি বিশেষ ধর্ম- খ্রিস্টবাদে নীত হন। নিশ্চিত

www.pathagar.com

ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথমজন ক্লানডেসটাইন খ্রিস্টান ছিলেন এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন সেন্ট পলের অনুসারী। জেরোমী তাঁর 'De Veris Illustribus' বইয়ে সেনেকাকে গীর্জাকেন্দ্রিক লেখকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

খ্রিস্টবাদ একটি মহৎ ধর্ম ও একটি মহৎ নীতির মধ্যেকার সামঞ্জস্য ও ঐক্যের চমৎকার উদাহরণ। রেনেসাঁ যুগের শিল্প সম্পূর্ণরূপে বাইবেলীয় কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় এই বৃত্তে শিল্পকেও যুক্ত করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক চিন্তাভাবনা প্রাচীনতম মানবিক চিন্তা-ভাবনার একটি যার পূর্বজ সখা হল স্বর্গ তথা স্রষ্টার ধারণা। নীতির ইতিহাসে বস্তুত এমন কোন চিন্তাবিদ নেই যিনি ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেননি- হয় ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করার মাধ্যম অথবা বিপরীতটি প্রমাণ করার চেষ্টার মাধ্যমে। নীতির সমগ্র ইতিহাস ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তা-ভাবনার পারস্পরিক অপরিবর্তনীয়তার ইতিহাস। বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান প্রমাণ করতে না পারলেও এটা সুস্পষ্ট, ধর্মকেন্দ্রিক নীতিবিদরাই উৎরে গেছেন, যেখানে নাস্তিক নীতিবিদদের অবস্থান এখনও সংহত নয়।

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিক আন্দোলন অবচেতনভাবে ধর্মের দিকেই এগিয়েছে। ফরাসি সরকারি স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যভুক্ত করা হলেও সেখানে চার্চের ছায়া ঘুরে ফিরে আসে। কাজেই একজন সত্যিকার ধার্মিক মানুষের পক্ষে বা একজন নীতিবান মানুষের পক্ষে অধার্মিক হওয়া কল্পনা করা যায় না। ধর্ম এক ধরনের জ্ঞান এবং নৈতিকতা হল সেই জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা জীবনের অনুপ্রেরণা। কিভাবে চিন্তা ও বিশ্বাস করতে হয়- ধর্ম সে প্রশ্নের উত্তর দেয়; কিভাবে আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যবিন্দু নির্ধারণ করতে হয় এবং কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়- সে প্রশ্নের উত্তর দেয় নৈতিকতা। অন্যকথায় ধর্ম হল বিশ্বাস, নীতি হল কর্ম। মানুষ এ দুটো জিনিষকেই একত্র করতে চায় না। কুরআন পঞ্চান্নবারেরও বেশি "বিশ্বাস কর এবং ভাল কাজ কর"- এই বলে তা একীভূত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কুরআন বলছে না "বিশ্বাস কর, তাহলে তুমি ভাল মানুষ হতে পারবে।" বরং বলছে, "ভাল মানুষ হও, তাহলেই তুমি বিশ্বাস করবে।" কিংবা "তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষটি দান না করা পর্যন্ত তোমার বিশ্বাস যথার্থ নয়।" কিংবা কিভাবে ব্যক্তি তার বিশ্বাসকে মজবুত করতে পারবে তার উত্তর এই, "সৎ কাজ কর, সৎ কাজের মাধ্যমে তুমি তোমার স্রষ্টাকে পাবে।"

www.pathagar.com

টীকা

১. David Hume : Treaties on Human Nature.

২. Hegel বলছেন, "The essence of spirit is freedom in the same way as the essence of matter is weight."

৩. Victor Hugo-এর Les Miserable উপন্যাসের নায়ক।

৪. Hutchinson : System of Moral Philosophy, Vol. 1 Part VI.

৫. যথাক্রমে Remy Collin-এর 'Plaidoyers Pour La Vie Humalthe' এবং Vozhesensky-এর 'Oya' শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।

৬. একজন পণ্ডিতের মতে প্রকৃতি .(Nature) শব্দটির ৫২টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমাদের আলোচনায় এই শব্দটি মানবিক নির্যাসের উর্ধ্বে সকল বাহ্য বাস্তবতার আধাররূপে গৃহীত।

৭. Mandeville : Research on the Essence of Society; আরও দেখুন Henry Thomas Buckle : History of Civilization in England এবং এর সাথে তুলনা করুন .Hegel-এর মন্তব্য "evil is a form in which the moving force of the world's development appears."

৮. নীট্‌শের চিন্তা-ভাবনা যদি ডারউইনীয় তত্ত্বের দার্শনিক ধারাবাহিকতা হয় তাহলে হিটলারের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রও উপরোক্ত এই মতবাদেরই রাজনৈতিক স্ফুরণ।

৯. বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইবন অর-রুশ্‌দ .(Averoes) এটা চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে নৈতিকতা হল সার্বজনীন ধর্মের সারসত্য।

১০. Pierre Abelard তাঁকে খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টান বিবেচনা করেছেন।

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও ইতিহাস

প্রারম্ভিক মানবতাবাদ

বুদ্ধিবাদী ও বস্তুবাদী– উভয় দলই ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় থিতু হয়ে আছে যে, পৃথিবীর বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে নিম্নতম পর্যায় থেকে এবং গুটিকয় অচলাবস্থা ও ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতিহাস অনবরত এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। অন্যকথায় তুলনামূলকভাবে বর্তমান কালটি অতীত কাল থেকে উন্নত এবং ভবিষ্যত থেকে অবনত। এ নিয়মেই ইতিহাস চলছে– তাঁদের মতে।

বস্তুবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক কারণ তাঁদের নিকট ইতিহাস হল মানুষের বস্তুগত প্রগতি। তাঁদের চিন্তাধারা বস্তু ও সমাজকে ঘিরে, স্বয়ং মানুষকে ঘিরে নয়। ফলত এটা সংস্কৃতির ইতিহাস নয়, বরং সভ্যতার ইতিহাস।

মানুষ ও সংস্কৃতির ইতিহাস শূন্য থেকে শুরু হতে পারে না, তেমনি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ক্রমঅগ্রগতির ধারাতেও একনিষ্ঠ হতে পারে না। মানুষ ইতিহাসে প্রবেশ করেছে প্রবল নৈতিকতাসহ যা সে তার 'পশুত্বময় পূর্বসূরী'র নিকট থেকে পায়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে পশু ও আদিম মানুষের সহাবস্থানের সময় যে মানবিক গুণাবলী মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছিল বিজ্ঞান তা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্বীকারও করেছে, কিন্তু কখনোই ব্যাখ্যা করেনি। গোড়াতেই (a priori) ধর্মীয় অনুধাবনাগুলো প্রত্যাখ্যান করার ফলে বিজ্ঞান এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[১]

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন লুইস মরগান তাঁর 'Ancient Society' বইয়ে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ রকম ঃ[২]

- একটি গোত্রের সকলে মিলে তাদের নেতা পছন্দ করে, আবার সকলে মিলেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত নেতা পুনরায় গোত্রের অপরাপর সদস্য তথা সাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হয়।
- একই গোত্রের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ও যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ থাকে।
- গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এতই প্রবল যে, অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মউৎসর্গের পর্যায় অতিক্রম করে।
- বন্দীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয়।
- গোত্রের সকল সদস্যই মুক্ত, স্বাধীন থাকে।
- গোত্রে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ধর্মীয় রীতিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নৃত্য ও নাটকের মধ্যে। প্রতিমার অস্তিত্ব নেই।

www.pathagar.com

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক মনোভাব অস্তিত্বশীল থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই চিত্র দেখে এঙ্গেলস পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন, "কী চমৎকার সংবিধান! কী শিশুসুলভ সরলতা! সেনাবাহিনী নেই, পুলিশ, পাদ্রী, রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, আইন, জেল কিছুই নেই– অথচ সব কিছুই সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নারী–পুরুষ সবাই স্বাধীন ; কোন দাসত্ব নেই, এক গোত্রের ওপর আরেক গোত্রের আধিপত্য নেই।"[৩]

মর্গান বর্ণিত সমাজচিত্রকে শৈল্পিকভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তারই দেশের ঔপন্যাসিক ফেনিমোর কুপার। সন্দেহ নেই, র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসনের মনেও একই প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে যখন তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে লেখেন, "আমি এদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দেখেছি এবং যত বেশি হিংস্রতা তাদের মধ্যে, তত বেশি মহত্ত্ব।"

টলস্টয় তাঁর সামাজিক আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছেন আদিম রুশ কৃষকদের নিষ্কলুষ সরল জীবনধারায়। এখানে এবং সর্বত্রই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলো নীচু স্তরের বস্তুগত ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত থেকেছে।

ইউনেস্কো প্রকাশিত 'General History of Africa,[৪] বইয়ে আমরা আদিম আফ্রিকীয় মানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহোদ্দীপক চিত্র পাই। উদাহরণস্বরূপ জানা যাচ্ছে যে, প্রাচীন আফ্রিকীয় রাজ্যগুলোতে বিদেশী, সাদা কিংবা কালো, আগন্তুকদের আন্তরিক আতিথ্য দেওয়া হত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতই সমস্ত সুযোগ–সুবিধা ভোগ করত তারা। অথচ একই সময়ে প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমে বিদেশী আগন্তুকদেরকে দাস হিসেবে গণ্য করা হত। এগুলো লক্ষ্য করে বিখ্যাত জার্মান জাতিতাত্ত্বিক লিও ফ্রবেনিয়াস বলছেন, "The Africans are civilized upto their bones, and the idea of their being barbarians is a Europen fiction."[৫]

আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকা বা তাহিতির আদিবাসী কিংবা আদিম রুশ কৃষক বা ভারতের ব্রাত্য শ্রেণী– যাদের মধ্যে এই মানবিক মূল্যবোধগুলো জীবন্ত ছিল– এদের উৎপত্তি কোথায়? এবং কেন তারা ইতিহাসের প্রারম্ভে অস্তিত্বশীল থাকলেও ঐতিহাসিক প্রগতির সাথে সাথে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল?

মর্গান তাঁর সুপরিচিত বইটি শেষ করেন এই কথাগুলো বলে, "রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সাধারণ শিক্ষা বয়ে থাকবে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। এবং সেটা হবে সেই আদিম মানুষের স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নবতর পুনরাবৃত্তি।"

অর্থাৎ মর্গানের মতে ভবিষ্যত সভ্য সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আসবে তিনটি

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা দ্বারা ঃ অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল (১) আদিম সমাজে সাম্য-স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ব অভিজ্ঞতা, মন ও বিজ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়নি এবং (২) মর্গানের বইটি লিখিত হওয়ার (১৮৭৭) পরবর্তী সময়পর্ব পর্যবেক্ষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

ইতিহাস তথাকথিত বর্বররা লিখছে না, ইতিহাস লিখছি আমরা। আমরা যত বেশি সভ্য হচ্ছি তাদের প্রতি আমাদের বোধ তত বেশি ঝাপসা হয়ে আসছে। কেউ যখন গণহত্যা চালায় কিংবা কোন সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায় তখন তাকে আমরা বর্বরতা বলি, অপরদিকে যখন সহমর্মিতা ও মানবিকতার দাবি জানাই তখন বলি, "সভ্য জাতির মত আচরণ কর"। অর্থাৎ সকল ভালত্বে অধিকার আমাদের, মন্দত্বে তাদের। অথচ ইতিহাসের ধারা কি সাক্ষ্য দেয়? সুসভ্য স্প্যানিশরা কি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে মায়া ও এ্যাজটেক এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেনি? সভ্য ও সাদা চামড়ার বসতি স্থাপনকারীরা কি পরিকল্পনা মাফিক ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি? মার্কিন সরকারের অনুদান কি তাদের সংস্কৃতির যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? তিন শ' বছর ধরে ইওরো-মার্কিন সভ্যতার ধারকেরা যে দাস ব্যবসা চালিয়ে এসেছে তা কি ইতিহাস থেকে মুছে যাবে কখনো? ঐ সময়ে তের থেকে পনের মিলিয়ন (সঠিক সংখ্যা কোন কালেই জানা যাবে না) মানুষকে ধরা হয়েছিল নিতান্ত পশু শিকারের মতই।

এ প্রেক্ষিতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কথা আসে যেখানে পশ্চিমা এবং অনুন্নত, অল্প সভ্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উপায়টি হল ছল-চাতুরি, ভণ্ডামি ও অর্থনৈতিক দাসত্ব আরোপ এবং সে সাথে চলছে দুর্বলদের বস্তুগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের চক্রান্ত।

মধ্যযুগের[৮] ব্যাপারে আমাদের সংস্কারও একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাযোগ্য। মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকার ও অস্বস্তির যুগ? সভ্যতার বিচারে হয়ত তাই। ইওরোপীয় বস্তুবাদী দার্শনিক হেলভেটিয়াসের ভাষায় মধ্যযুগে মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষের আইন পরিণত হয়েছিল দুর্বোধ্যতার আখড়ায়। কিন্তু বলা বাহুল্য খ্রিস্টান দার্শনিক নিকোলাই বার্দায়েজেভ বা চিত্রকর জাঁ আরপ-এর নিকট মধ্যযুগ সেভাবে প্রতিভাত হবে না।[৬] সত্যি কথা হল , সচ্ছলতা ও আয়েশের ঘাটতি থাকলেও মধ্যযুগীয় সমাজ সব সময় অন্তর্নিষ্ঠ সারবত্তায় পরিপূর্ণ থেকেছে। সময়টি ছিল আধ্যাত্মিকতা ও মননমন্থনের স্বর্ণযুগ যা ছাড়া পশ্চিমা মানুষের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগ জন্ম দিয়েছে চমকপ্রদ বিশাল শিল্পকর্ম এবং সুসমন্বয় ঘটিয়েছে একটি মহান ধর্ম (খ্রিস্ট) ও একটি মহৎ দর্শনের (গ্রীক) মধ্যে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সৃষ্টিপ্রকৌশল হিসেবে গথিক রীতির জন্ম এই মধ্যযুগেই। এই যুগ বৈজ্ঞানিক ও

www.pathagar.com

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে যে অন্যতর উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তাকে এ এন হোয়াইটহেড বলছেন "qualitative progress."[৭]

শিল্প ও ইতিহাস

একদিক থেকে বলতে গেলে, সংস্কৃতি কাল ও ইতিহাসের উর্ধ্বে। সংস্কৃতির উত্থান ও পতন আছে, কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে এর কোন আত্মীয়তা নেই। শিল্পে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নেই, যেমনটি বিজ্ঞানে রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে আজ অবধি আমরা শিল্পে প্রকাশ ক্ষমতার কোন বর্ধিত পর্যায় খুঁজে পাইনে, প্রগতির সমান্তরালে। সেই আদিকালের শিল্পের যে অনুভাবনা ও বোধ, আজকের মহৎ শিল্পেরও তাই।

সভ্যতার যেমন প্রস্তর যুগ, ইস্পাত যুগ ইত্যাদি আছে, সংস্কৃতির সে ধরনের কোন উর্ধ্বমুখী স্তর নেই। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে নব্য প্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে এক ধাপ অগ্রসর, কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বরং উল্টোটি। সে ব্যাখ্যা শিল্পের মধ্যেই রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ থেকে কয়েক হাজার বছর পুরনো হলেও সে সময়ের শিল্প পরবর্তী সময়ের শিল্পের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়, খাঁটি। কবিতা সর্বত্রই গদ্যের পূর্বসূরী, সঙ্গীত মানুষের ভাষা বর্ণনা রীতির পূর্বজ। প্রমাণ রয়েছে যে প্রতিটি ধর্মই শুরুতে ছিল খাঁটি ও সরল, শুধু পরবর্তীকালেই এর মধ্যে ব্যবহারিক বিকৃতি এসেছে। এ পর্যায়ে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সংস্কৃতির নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা একটি ধারণাগত বৈপরীত্য ; এ ক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হল শুধু সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধারা লিপিবদ্ধ করা।

জ্যাক রিসলার বলছেন, "চার পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই, সত্যিকারের শৈল্পিক মূল্যমানতা অর্জন করে।" অনেক সমকালীন শিল্পী প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদাই, কাদা, মার্বেল, সোনা বা আলাবেস্টারের বিনম্র বিন্যাস থেকে স্বীয় শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন। এই প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো কখনো কমনীয় ও সূক্ষ্ম (যেমন, থটমস ২য় ও থটমস ৩য়-এর সময়ে), কখনো কঠিন চেহারার স্মারকচিহ্নরূপে উৎকীর্ণ (যেমন চিওপস-এর সময়ে) এবং কখনো বাস্তবিকতাপূর্ণ ও অল্প প্রতীকী (যেমন আকেনীটেন এর সময়ে)।[৯]

সভ্যতার চোখে আবিষ্কারকালে আমেরিকা প্রাচীন পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পিছিয়ে ছিল, এমন কি এলাকাটি এর লৌহ যুগেও পৌঁছায় নি (এইচ. জি. ওয়েলস জানাচ্ছেন)। কিন্তু সময়ের এই মাপযোগ আমেরিকার শিল্পজগতে আরোপ করা যায় না। বোনামপাক মন্দিরে, যেখানে আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম চিত্রকর্ম রক্ষিত আছে, আমরা অসাধারণ সৌন্দর্যময় দেয়ালচিত্র পাই। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে প্রদর্শিত মায়া ভাস্কর্যও একই

www.pathagar.com

অনুভব জাগ্রত করে।

নীটশের নিকট গ্রীক ট্র্যাজেডি শিল্প জগতের সবচেয়ে বড় অর্জন। তাঁর মতে মানব সংস্কৃতির সর্বোন্নত রূপ পাওয়া যেতে পারে গ্রীক সংস্কৃতিতেই।[১০] "কোন আধুনিক কবি হোমার কিংবা ধ্রুপদী গ্রীক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্বকে ছুঁতে পারেন নি"–বলছেন আঁদ্রে মরিস। রজার কৎ লিখছেন, "দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে কখনো আমার মনে হয়, প্লেটোর পর তা আর খুব বেশি অগ্রসর হয়নি।" সিসেরোর নীতি ভাবনানির্ভর লেখাগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে (যেমন 'ডি ফিনিবাস বলোনারাম এট মেলর্ম' কিংবা 'ডি এ্যামিসিয়া'), কিন্তু তাঁর শ্রমসংঘ বা রাষ্ট্র পদ্ধতির ওপরে সভ্যতাভিত্তিক লেখা আজকের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। একজন অজ্ঞাতনামা রোমান লেখকের বই 'ডি রিবাস বেলেসিস', যেখানে সামরিক সরঞ্জামাদির চিত্তাকর্ষক ড্রইং রয়েছে, সামরিক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান শুধু। কিন্তু আমরা সেনেকার 'সুখ' বা ভার্জিলের কবিতাকে আমাদের জীবনের খণ্ডপটে বাঁধতে পারিনে– তা আমাদের জীবনকে আপ্লুত করে সব দিক দিয়ে। সপ্তম ও অষ্টম শতকের ম্যানিয়োসি নামক চার হাজারের বেশি জাপানি কবিতার সংকলনটি (প্রধানত গীতি কবিতা) আজও বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম মহৎ শৈল্পিক অর্জন বলে বিবেচিত। অ্যাস্কাইলাস বা সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি সব সময়ই এক অনুপম সত্যের বাণীবাহক। ইউরিপিডেস লিখেছেন 'ট্রোজান উইমেন', দু হাজার বছর পর সার্ত্রে একই নামে লিখছেন আরেক নাটক। সৃষ্টি ভাবনার প্লাটফর্মে এদের মধ্যে আমরা কোন বিরোধিতা খুঁজে পাইনে। কিন্তু বিজ্ঞান সূত্র বৃত্তাবদ্ধ। এ্যারিস্টটলের পদার্থবিদ্যা, টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্যালেনের চিকিৎসাশাস্ত্র আজকের বিজ্ঞানের সাথে কতটুকু অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে? এ্যারিস্টটলের দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থ (Physics ও On Heaven) সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল বলছেন, "আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এই দুই বইয়ে লিখিত একটি বাক্যও আজ আর সময়োপযোগী নয়।"

শিল্প–তরঙ্গ প্রবাহিত হয় পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে। অন্য কথায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিন্তু বিজ্ঞানের চলাচল ঠিক বিপরীতক্রমে। অনিবার্য প্রভাবনাসহ প্রাচ্যের সঙ্গীত, হিন্দু লোকসঙ্গীত, আফ্রিকীয় নাচ ও গান, ওসানিয়ার শিল্প প্রবেশ করেছে পশ্চিমে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল বলে বিবেচিত ওসানিয়ার শিল্প স্থান পেয়েছে ইওরোপ আমেরিকার গ্যালারীতে। আফ্রিকীয় শিল্পের অবগুণ্ঠনের পর তা ইওরোপ আমেরিকার শিল্পে নবতর ঢেউ আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। পশ্চিমা সভ্যতা অপরাপর জগতের মৌলিক শিল্পকর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। শিল্পের এই সার্বজনীন অন্তর্যোগের কারণেই আইভরিকোস্টের আফ্রিকীয় মুখোশ এবং সিসটিন চ্যাপেলের ছাদচিত্র একই "sensory exitement" তৈরি করে।[১১]

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে ডাকারে উনত্রিশটি দেশের অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত আফ্রিকীয় শিল্পের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্কৃতি জগতের একটি অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু একই সাথে কোন আফ্রিকীয় দেশে আয়োজিত আফ্রিকীয় দেশগুলোর বাণিজ্য মেলা হয়ত কোন খবরেই আসবে না। শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কখনোই অনুন্নত নয়। কারণ শিল্পে অনুন্নত বা উন্নত বলে কিছু নেই। কালো আফ্রিকা তাই শিল্পকলা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের জগতে এক সত্যিকার পরাশক্তি।

নীতি ও ইতিহাস

আমরা কেন এ বিশ্ব সংসারে জীবন যাপন করছি– এ প্রশ্ন সংস্কৃতির আর কিভাবে জীবন যাপন করছি– এ প্রশ্ন সভ্যতার। একটি জীবনের অর্থ সম্পর্কিত, অপরটি জীবনের যাপন প্রণালী সম্পর্কিত। সভ্যতার নানা কীর্তি প্রতিভাত হচ্ছে সেই আগুন আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে জলকল, লোহা, লেখনী, ইঞ্জিন, আণবিক শক্তি, নভোচারণ ইত্যাদি ক্রমোৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সংস্কৃতির ভিন্ন চরিত্র। সে ঠিকই নতুনতরভাবে আরম্ভ করছে অনেক কিছু, কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মানুষের যে প্রতীকী ভালত্ব–মন্দত্ব, সদগুণ ও সংশয় তা তার মানবিক অস্তিত্বকেই সংহত করে।

আজকের সকল সংকট ও সমস্যা দু'হাজার বছর আগেই নীতি–ভাবনায় পরিচিত ছিল। মানবতার সকল মহৎ শিক্ষক, পয়গম্বর মুসা (আঃ), যীশু খ্রিষ্ট, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অপয়গম্বর কনফুসিয়াস, গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, কান্ট, টলস্টয়, মার্টিন বুবার (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে আজ অবধি) সকলে সারসত্য বিচারে বলতে গেলে একই নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। সামাজিক শৃংখলা ও উৎপাদনের নিয়ম থেকে নৈতিক মতগুলো পৃথক এবং তা অবিচ্ছিন্নতার পরিচায়ক। কিন্তু বাস্তব জীবনে সবকিছু বিপরীত ক্রমিক, যেমন জন কেন্থ গলব্রেইথ বলছেন, পরিবর্তনশীলতাই অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ম। নৈতিক সত্যগুলোর অপরিবর্তনীয়তার বীজ রোপিত হয়েছে সেই সৃষ্টির সময়ে যখন মানবিক দ্বন্দ্বপ্রকরণ ও রহস্যকেও আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এ কাজটি মানবেতিহাস শুরু হওয়ার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল স্বর্গে। বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারটি জানতে আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে না। যীশু খ্রিষ্ট তাঁর সত্য বার্তা উচ্চারণ করেন তাঁর শৈশবে এবং তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর মিশন সম্পন্ন করেন। খোদা ও মানুষ সম্পর্কে মহৎ সত্যগুলো উচ্চারণে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা কোনটিই প্রয়োজন হয়নি তাঁর। কারণ তা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধিগম্য নয়। তা "জ্ঞানী ও বিদ্বানদের নিকট লুক্কায়িত এবং শুধু অল্পসংখ্যক মানুষের নিকট প্রত্যাদিষ্ট নয় কি!"[১২]

www.pathagar.com

সারবস্তু নৈতিক নির্দেশনাগুলো স্থান-কাল ও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ও কর্মকাণ্ডের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি।[১৩] এপিকটেটাস ও মারকিউস-একজন দাস, অপরজন রাজা-একই নৈতিক শিক্ষা, এমন কি একই বাক্যমালা প্রচার করেন। সাধারণভাবে যে সমস্ত ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতির ধারণা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে জড়িত। নীতির মৌলিক চেতনায় আমরা সার্বজনীনতা লক্ষ্য করি। ব্যাপারটি কান্টের বিখ্যাত 'শর্তহীন আদেশে'র নীতি (Categoric Imperative) দ্বারাও দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে। এই নীতিটি, যা প্রাচীন চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পাওয়া যায় তা প্রথম সংজ্ঞায়িত হয়েছে কান্টের 'Foundation of the Metaphysics of Morals"-এ এইভাবে, "Work only according to the principle for which you may want to become a general law". এবং এরপর তাঁর 'Critique of Pure Reason'-এ বলছেন, "Work in such a way that the principle of your will can serve at any time as a principle of general legislation".

কিভাবে সৎ জীবন যাপন করতে হয় সে প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন গ্রীসের সাত সাধুর এক সাধু থেলেস (জন্ম ৬২৪ খ্রিঃপূঃ) বলেছিলেন, "যে কাজের জন্যে আমরা অন্যকে তিরস্কার করি, নিজেরা সেটা করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।" প্রাচীন রোমের সিসেরো বলেন, "অন্যের যা কিছুকে তুমি সমালোচনা কর নিজে সেটা করা থেকে দূরে থাকো।"[১৪] যীশু খ্রিস্টের সমসাময়িক এবং প্যালেস্টাইনে বাসরত ইহুদি চিন্তাবিদ হিল্লেল নৈতিকতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যা তুমি নিজের জন্যে চাও না তা তোমার প্রতিবেশীর জন্যে চেও না। সমগ্র তওরাত এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত।"[১৫] বুদ্ধ ও পিথাগোরাসের সমসাময়িক কুনফুসিয়াসও একই শিক্ষা প্রচার করেন চীন দেশে ঃ "আমি নিজে যা করতে চাইনে, তা অন্যের জন্যে করি না।"[১৬] একই নীতি যীশু খ্রিস্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত এই উক্তিতে ঃ "Do unto others as you would have them unto you"[১৭]-Categoric Imperative-এর এই চিত্র প্রমাণ করে যে, সার্বজনীন নৈতিক নীতির কোন প্রগতিশীল ইতিহাস নেই। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু সারসত্যটি সর্বত্রই এক।

www.pathagar.com

শিল্পী ও অভিজ্ঞতা

শিল্পের যেমন বিবর্তন নেই, শিল্পীর জীবনও তেমনি বিবর্তনহীন। প্রত্যেক শিল্পী শিল্প সৃষ্টিতে একেবারে আনকোরা, যেন তার পূর্বে আর কেউ কিছুই সৃষ্টি করেনি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কারও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন না। অন্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন ও সংগ্রহ বিজ্ঞানভিত্তিকতার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শিল্পে অন্যের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের অর্থ হল অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি তথা এক কথায় শিল্পের অকাল মৃত্যু।

পিকাসো সত্তর বছর ধরে আঁকেন এবং এই সময়পর্বে তিনি কিউবিজম, নব্য কিউবিজম, অভিজ্ঞতাবাদ ও পরাবাস্তববাদের পর্যায় অতিক্রম করেন, কিন্তু ব্যাপারটি শিল্পীর মন্দ থেকে ভালোর দিকে কিংবা অপূর্ণাঙ্গতা থেকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে গমনের নির্দেশ দেয় না। এটা কোন বিবর্তন নয়, বরং আবহমান মানবিক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার প্রতি সাড়া দেওয়া।

শিল্পের এই অভিজ্ঞতা-অনির্ভর ও ইতিহাসহীন চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বড়দের জন্যে এক ধরনের বিজ্ঞান এবং ছোটদের জন্যে আরেক ধরনের বিজ্ঞান। বাচ্চাদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও বয়সের ওপরে তার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু বোঝা নির্ভর করে। কিন্তু সে অর্থে এমন সঙ্গীত নেই যা উপভোগ করার জন্যে বাচ্চাদের বড় হয়ে উঠতে হয়। বাক, মোৎসার্ট, বেতোফেন, দেবুসী প্রমুখের সুরলহরী বুঝুক আর না বুঝুক, ছোট বড় সকলের মনেই তা সমান সাড়া জাগায়। বেতোফেনের বিখ্যাত বত্রিশ সনেটের সুরচক্র একদিকে তরুণ ছাত্রদের সাহিত্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার তা স্বনামখ্যাত পিয়ানো শিল্পীর পিয়ানোতে বাজানো হচ্ছে ক্লাসিক আবহে।

পিকাসো কথা বলতে শেখার আগেই মাত্র দু'বছর বয়সে ছবি এঁকেছেন। তাঁর বয়সী শিশুরা সবে যখন শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে, ওভিড তখন কথা বলতেন ষট্‌পদীতে। মাত্র ছয় বছর বয়সে মোৎসার্টের প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং শিল্প জ্ঞান নয়, অন্তর্মন্থিত উপলব্ধি। দিনভর কাজ শেষে একজন কৃষক একখণ্ড কাঠ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাই করা শুরু করতে পারেন-দশ বছরের একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই তার। কাজেই বিশেষ প্রতিভাও শিল্পে সবকিছু নয়। স্মরণ করা যেতে পারে টলস্টয় ও তাঁর প্রতিষ্ঠান "ইয়াসানীয়া পলিয়ানা"-কে যেখানে তিনি গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক আলোচনায় বসতেন শুধু শিশুদেরসাথে।[১৮] কাজেই শিল্প, ধর্ম ও নীতিক ভাবনা বোঝার উপকরণ বুদ্ধি ও যুক্তি থেকে নয়, আসছে অন্তর্গত প্রদেশ থেকে। এখানে একটি যুক্তি আরেকটি যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না; একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়ে একনিষ্ঠ হচ্ছে গভীর মমত্বসহকারে।

www.pathagar.com

টীকা

১. এই সময়ের জীবন্ত স্মৃতি প্রায় সকল জাতির কিংবদন্তী ও রূপকথায় পাওয়া যায়, স্বর্ণযুগের মীথ হিসেবে। বাইবেলের Age of the Patriarches এখানে উল্লেখ্য। এই সময়পর্ব যে ভাল ছিল না–সে বিবেচনা এসেছে শুধু বিবর্তনবাদের সাথে। Bertrand Russell তাঁর 'History of Western Philosophy' বইয়ে বলছেন, "The common belief that the past had been bad appeared only with the theory of evolution."

২. Morgan তাঁর উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন উত্তর আমেরিকার Iroquois কৌম থেকে যা এ জাতীয় আলোচনার মডেল হিসেবে গৃহীত।

৩. Engels : The Origin of The Family, Private Property and the State, New York, 1928, P. 86.

৪. UNESCO কর্তৃক সম্পাদিত। পরিকল্পিত ৮ খণ্ডের ২ খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত।

৫. বোঝাই যাচ্ছে, Frobenius এখানে civilized শব্দটি ব্যবহার করেছেন Cultured–এর অর্থেই।

৬. Jean Arp : "I am against mechanized things and chemical formulas. I like the middle ages, its tapestries and sculptures".

৭. Whitehead : The Future of Religion.

৮. এখানে অবশ্যই আমরা ইওরোপের মধ্যযুগের কথা বলছি। এ অর্থে মধ্যযুগ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিরাজ করছিল না। যেমন, ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ইসলামী সভ্যতা সে সময়ে উৎকর্ষ লাভ করছিল ক্রমাগত।

৯. Jacque Risler : La Civilization Arabe.

১০. একই ধরনের বিবৃতি মার্কস দিয়েছেন; তাঁর নিকট প্রাচীন শিল্পকর্ম উপস্থাপন করে "unreachable norms and models". কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে মার্কস বুঝতে পারেন নি যে, তাঁরই বিবৃতি তাঁর দর্শনের বিরোধিতা করছে। সংস্কৃতি যদি সভ্যতা এবং এর উপরিকাঠামোর প্রতিফলন হয় তাহলে তা কেন unreachable হবে? আর কেনই বা সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার আগেই আদিম সমাজে এর অস্তিত্ব থাকবে?

১১. Faure : The Spirit of Forms.

১২. St. Luke 10 : 21.

১৩. Tolstoy বলছেন, "খোদা কি? –এ ব্যাপারে যদিও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু খোদা তাদের নিকট কি চায় সে ব্যাপারটি যেন সকলেই সমানভাবে বুঝে থাকেন।"

১৪. Diogenes Laeritus 1, 36.

১৫. Babylonian Talmud, Part-Sabbath.

১৬. Lun-Yu : Thoughts and Talks of Confusious.

১৭. St. Matthew 7:2 and St. Luke 6:31.

১৮. Petrov : Tolstoy'.

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও 'সামাজিক ব্যক্তি'

ইতিহাসের এই এক ট্র্যাজেডি যে ইওরোপে ইউটোপিয়ার ধারণাটি প্রথম আসে একজন খ্রিস্টানের নিকট থেকে।[১] Campanella-এর 'City of the Sun' সবদিক দিয়েই খ্রিস্ট ধর্মবিরোধী। কারণ তা স্বর্গীয় রাজ্যের পরিবর্তে ইহজাগতিক রাজ্যের পক্ষে ওকালতি করে; ফলত তা মানুষের সাথে নয়, সমাজের সাথে সম্পর্কিত। 'The City of the Sun' খ্রিস্টবাদের প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি ইওরোপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বকাঠামোর প্রারম্ভেরও নির্দেশক।

ধর্ম বাহ্য পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করে না। এটা এক ধরনের প্যাশ্‌ন ও বাধ্যবাধকতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিভূ নয়। যীশু খ্রিস্ট সমাজ সংস্কারক নন, ঠিক যেমনটি ফরাসি বিপ্লব বৈজ্ঞানিক প্রগতি; খ্রিস্টীয় শান্তি ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ নয়। যীশু খ্রিস্ট মানবাত্মা ও মানুষের মুক্তির চিন্তায় আবিষ্ট ছিলেন, যেখান ইউটোপিয়া হল শান্তি-সম্প্রীতির আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার শিশুসুলভ স্বপ্ন। একটি অগ্রসরমান স্বর্গলোকের (Civitas Dei) দিকে, আরেকটি মর্ত্যলোকের (Civitas Solis) দিকে।

ড্রামা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে অজ্ঞ, আর ইউটোপিয়া অজ্ঞ মানুষের মূল্য সম্পর্কে। তাই মার্কস বলছেন, 'অত্যাচারিত' (Exploited)-এর কথা, দস্তয়েভস্কি বলছেন, 'অপমানিত' (the humiliated and insulted)-এর কথা ঃ " Social utopia depicted relationships in which people ceased being tortured and exploited; natural law built up relations in which they are not the humiliated and insulted".[২]

Campenella যখন তাঁর আর্দশ সমাজ বিষয়ে লিখছিলেন, সন্দেহ নেই তিনি প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমের খ্রিস্টীয় ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বেচারা সাধু দেখতে পারেন নি যে, এখানে প্রতিবেশী বা দূরের বান্ধব-কোনটিই মুখ্য নয়। তারা অন্তর্হিত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে উৎপাদন, ভোগ ও শ্রম বন্টনের সম্পর্কের মধ্যে। ভালত্ব বা মন্দত্ব, ভালবাসা বা ঘৃণা কোন কিছুর সাথেই এই প্রতিবেশী সম্পর্কিত নয়। কারণ সে আত্মাহীন, সে একজন বেনামী কিন্তু নিখুঁত ব্যক্তি যে তার জন্যে নির্দিষ্ট কাজ ধারাবাহিকভাবে করে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি।

এভাবে আমরা দেখি, ইউটোপিয়া ও ড্রামার জগৎ পরস্পর মেরুদূরত্বে। একদিকে সুসমান বৈচিত্র্যহীনতা ও যান্ত্রিকতা, আরেকদিকে আত্মাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যের রাজ্য-

www.pathagar.com

সেক্সপিয়ার, দস্তয়েভস্কি প্রমুখ মহামানবেরা যার প্রতিনিধি।

মানুষকে যখন যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন পশু হিসেবে ধরা হয় তখনই সে ইউটোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি সহযোগে তার চাহিদা পূরণের নিয়মনিষ্ঠ প্রচেষ্টা তাকে ইউটোপিয়ার আদর্শ নাগরিক করে তোলে। কাজেই মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে ইউটোপিয়ার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। ডারউইনের মতে ইউটোপিয়ার আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মানুষকে কাটছাঁট (tailoring) করতে হবে; কারণ সাধারণভাবে একজন মানুষ এতটাই ব্যক্তিবাদী ও অসম্ভব রোমান্টিক যে সে ইউটোপিয়ার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা নির্মূলকরণই ইউটোপিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

কিন্তু মানুষ যদি perfect animal না হয় এবং ব্যক্তিত্ববাহী হয় তাহলে এই ইউটোপিয়া মায়া ও একটি স্কীমমাত্র। ইউটোপিয়ার সম্ভাবনা অসম্ভব হয়ে ওঠে সৃষ্টি সাধনের মুহূর্তটিতে যখন মানুষের 'মানবিকীকরণ' সম্পন্ন হয়। সে মুহূর্ত থেকেই মানুষ শাশ্বত দ্বন্দ্ব, অশান্তি, অতৃপ্তি তথা ড্রামার মুখোমুখি হয়েছে, "তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্যে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।"[৩]

কাজেই ইউটোপিয়া ও ড্রামার দ্বন্দ্ব অনিবার্য। ইউটোপিয়ার দ্রষ্টারা সমাজ ও সামাজিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা চেয়েছেন মানুষের মানবিক ভূমিকা। তিনি ড্রামা তথা বৈচিত্র্যের ভুবনে মানুষের মধ্যে ইচ্ছাস্বাধীনতার বীজ প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন যেন সে তাকে ও তার আত্মাকে স্বীকৃত ও মূল্যায়িত করতে পারে।

ইউটোপিয়া ও পরিবার

পরিবার ও সমাজ সমস্বভাবী নয়। পারিবারিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ভালবাসা বা আবেগের ওপর, সামাজিক সম্পর্ক স্থিত স্বার্থ ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর। সমাজের ক্রমঅগ্রসরতার অর্থ পরিবারের ক্রমঅবনমন। সামাজিক নীতিমালা যখন চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয় তথা যখন ইউটোপিয়া পর্যায়ে পৌছায়, তখন তাদের পক্ষ থেকে পরিবারের স্বীকৃতি মেলে না একেবারেই। প্রাণচাঞ্চল্যময়, রোমান্টিক এবং ব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধরূপে পরিবার ইউটোপিয়ার সকল ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠে। এঙ্গেলস বিবর্তনের এক পর্যায়ে পরিবার শুধু নয়, বিবাহের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হওয়ার ব্যাপারেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।[৪]

ইউটোপিয়াতে অন্য অনেক কিছুর মত সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারটিও আবেগবর্জিত। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ বলছেন, কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়স্ক নারীরা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুরুষদের সাথে বিশেষ ঘরে অবস্থান করবে। এ প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী

www.pathagar.com

সন্তান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে– তাদের পিতামাতাকে না জেনে শুনেই। বিশ বছরের কমবয়স্ক নারী এবং পঞ্চাশোর্ধ পুরুষের যৌন সঙ্গমের অধিকার থাকবে, কিন্তু এর ফলশ্রুতি সরিয়ে ফেলতে হবে (গর্ভপাত) অথবা যদি শিশুর জন্ম হয়েই যায় তাহলে তাকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করতে হবে। ভালবাসা ও পারিবারিক জীবনের অপসারণ করতে হবে।[৫]

এঙ্গেলস আরও পরিষ্কারভাবে বলছেন, "বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী ইতিহাসের চূড়ান্ত নির্ধারণী সূত্র হল জীবনের আশু প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন। এটা আবার দুই রকমের; একদিকে অস্তিত্ব নির্বাহী দ্রব্য তথা খাদ্য–বাসস্থান এবং এগুলো উৎপাদনের যন্ত্রপাতি উৎপাদন, অপরদিকে স্বয়ং মানুষ উৎপাদন তথা বর্তমান মানব প্রজাতির বংশ বিস্তার।[৬] তিনি আরেক স্থানে বলছেন, "এটা পরিষ্কার যে, নারী স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হল উন্মুক্ত কর্মকাণ্ডে তার অংশ গ্রহণ এবং এর অর্থ আর্থ–সামাজিক একক হিসেবে পরিবারের বিলোপ সাধন। উৎপাদন মাধ্যম সাধারণ মালিকানায় বদলি হওয়ার সাথে সাথে পরিবার সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। ঘরকন্নার কাজটি সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে বিলীন হয়ে যায়। শিশুদের দেখাশুনা ও শিক্ষা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণত গণকার্যক্রম এবং সমাজ সমস্ত শিশুর দেখাশুনার ভার নেয়– হোক তারা বৈধ বা অবৈধ।"[৭]

মার্কস–এর বক্তব্য অনুযায়ী পরিবারের বিলুপ্তির অর্থ হল মানুষের পূর্ণাঙ্গ সামাজিকীকরণ। ফরাসি নারীবাদী লেখিকা এবং ইওরোপে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সিমন ডি বুভোয়ার আর এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, "পরিবার ও মাতৃত্বের মীথ এবং মাতৃক প্রবণতা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত নারী অধীনতার শিকার হয়েই থাকবে।"[৮]

সত্যতা শুধু তত্ত্বেই পরিবারের নিরাকরণ করতে চাইছে না, বাস্তবেও তা করছে। তার চিহ্ন আজ সুস্পষ্ট; বিবাহের সংখ্যা কমছে, বিবাহ বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত বাড়ছে। বাড়ছে অবৈধ শিশু ও নিঃসঙ্গ সংসারীর সংখ্যা। ১৯৬০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন বিবাহের সংখ্যা বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যার সমান সমান ছিল। এই ক্যালিফোর্নিয়া অনুপাত সভ্য পৃথিবীর অন্যান্য কেন্দ্রেও সহজলভ্য। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় শতকরা ছাব্বিশটি বিবাহ বিচ্ছেদের খতিয়ান ছিল। ১৯৭৫–এ এসে তা দাঁড়ায় শতকরা আটচল্লিশটিতে। ইওরোপ জুড়ে অন্যান্য দেশেও একই চিত্র। ফ্রান্সের বিদ্যালয়গামী কিশোরীদের মধ্যে নেয়া একটি জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, মুক্ত ও সহজ জীবন সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত, পরিবারের জন্যে আকাঙ্ক্ষাটি তালিকার তলদেশে।[৯] স্টকহোমের সামাজিক গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রকাশিত আরেকটি জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে যে, গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিতরাই যথেষ্ট সচ্ছল এবং এই বৃত্তিতে তারা নিয়োজিত থাকছে আগ্রহ সহকারে মধুর জীবন যাপনের জন্যে। আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা অবৈধ শিশু উৎপাদনের দিক দিয়ে নেতৃস্থানে–তাদের মোট

www.pathagar.com

জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ অবৈধ শিশু। গত পাঁচ বছরে ঘর পালানো বাচ্চাদের সংখ্যা আমেরিকাতে দ্বিগুণ বেড়ে দুই মিলিয়নে পৌঁছেছে।

সকল ধর্ম পরিবারকে মানুষের শান্তির আধার এবং মাকে শিশুর অপ্রতিকল্পনীয় শিক্ষকরূপে দেখেছে। অন্যদিকে সব ইউটোপিয়া সানন্দে কথা বলছে সামাজিক শিক্ষা, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন, শিশু আলয় ইত্যাদির কথা যেখানে সব কিছুই থাকছে, থাকছে না মাতৃত্বের ছোঁয়া। সব কিছু পরিচালনা করছে বেতনভুক কর্মীরা। ইউটোপিয়ার আদি প্রবক্তা প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'–এ পদ্ধতিগতভাবে সামাজিক শিক্ষার ধারণাকে তুলে ধরেন। এই ধারণা উনিশ ও বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক লেখায় উচ্চকিত হয়। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটি যথেষ্ট যৌক্তিক; মানুষ যদি সামাজিক পশু হয় তাহলে সামাজিক শিক্ষা, নার্সারী এবং তথাকথিত আদর্শ সমাজই সঠিক সমাধান; সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভালবাসা, শৈল্পিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা এগুলো হালকা রোমান্টিসিজম ছাড়া কিছুই নয়। একটি আদর্শ সমাজে সকলেই স্বীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে কোন ভ্রান্তি ছাড়া–যথার্থরূপে, সেখানে সম্পূর্ণ সমরূপতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা উপস্থিত থাকছে। সেক্ষেত্রে মা ও পরিবার জঞ্জালমাত্র। এ প্রসঙ্গে 'দ্য ক্যাপিটালে'র সুপরিচিত বাক্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "The children of both sexes should firstly be protected from their own parents".

সভ্যতা নারীকে সম্মান ও উপযোগিতার আসনে বসিয়েছে, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। সুন্দরী প্রতিযোগিতা, মডেলিং ও ফটোমডেলিং তাকে এক সুন্দর পশুর চেয়ে ওপরে নিতে পারছে না।

সভ্যতা মাতৃত্বকে ছিন্নভিন্ন করে বিলিয়ে দিয়েছে সেলসগার্ল, মডেল, শিক্ষিকা (অন্যের বাচ্চাদের), সেক্রেটারী প্রভৃতিতে। সভ্যতা–ই মাতৃত্বকে এক ধরনের দাসত্ব বলে ঘোষণা দেয় এবং তা থেকে তাকে মুক্ত করতে অঙ্গীকার করে। কত নারীকে কর্মের মুক্ত অঙ্গনে তারা আনতে পেরেছে সেই হিসেব করে সভ্যতা গর্বিত হয়। বিপরীতক্রমে সংস্কৃতিতে সব সময়ই মা একটি প্রতীক, রহস্য ও পবিত্রতার একক। সংস্কৃতি তার সর্বোৎকৃষ্ট পংক্তিমালা, সঞ্জীবনী সঙ্গীত, তার সুন্দরতম চিত্র ও ভাস্কর্য মা–কেই উৎসর্গ করেছে। মা ও মাতৃত্বের ধারণাটি যখন সভ্যতার দ্বারা বিপর্যস্ত তখন পিকাসো তুমুল অনুভাবনা সহকারে আঁকলেন "Motherhood" এবং ঘোষণা করলেন যে, সংস্কৃতিতে মা এখনও জীবন্ত সত্তা।

www.pathagar.com

টীকা

১. Tommaso Campanella: Civitas Solis/The City of the Sun.

২. Ernst Bloch: Natural Law and Human Dignity, Beograd, 1977, p.7.

৩. কুরআন২ঃ৩৬।

৪. Engels: The Origin of the Family, Private Property and the State, New York, 1942, p.41.

৫. ইউটোপিয়া প্রেম-ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তা ব্যক্তিগত সম্পর্কের নির্দেশক, সামাজিক সম্পর্কের নয়। ইউটোপিয়া অর্জনের বাস্তব প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভালবাসাকে বুর্জোয়া প্রবণতা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তরুণদেরকে পুনঃশিক্ষা প্রদান করা।

৬. Engels: ibid, introduction to the 1884 edition.

৭. Engels: ibid, p.67.

৮. নিউ ইর্য়কের Saturday Review পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে , সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।

৯. ১৯৬০ সালে জার্মানীর বন-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে B. Jazzo প্রদত্তরিপোর্ট।

www.pathagar.com

মুসা (আঃ)–যীশু খ্রিস্ট–মুহাম্মদ (সাঃ)–ইসলাম –দ্বিপ্রান্তিকতা

ইসলামের ইতিহাস দুটি–একটি মুহাম্মদ (সাঃ)–এর পূর্বের, অপরটি মুহাম্মদ (সাঃ)–এর পরের। প্রথমোক্ত পর্যায়, বিশেষত ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্ম, সম্পর্কে যদি পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইসলামকে বোঝা যাবে না।

এই তিনটি ধর্ম মানুষের ইতিহাসে ব্যাপকতম ভূমিকা পালন করে এসেছে; এদের মাধ্যমেই মানুষ ইতিহাসের পাতায় সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছে এবং মানবিকতাকে ধারণ করতে শিখেছে। এদের মাধ্যমেই মানুষ বাহ্যিক জীবন ও অন্তঃস্থ জীবন, বাহ্যিক প্রগতি ও অভ্যন্তরীণ প্রগতি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টবাদের ঐতিহাসিক সাফল্য, অতঃপর ব্যর্থতার অর্থ হল মানব জাতিকে চূড়ান্তরূপে ইসলামী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করা। এ প্রেক্ষিতেই মুসা (আঃ), যীশু খ্রিস্ট ও মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন তিনটি মৌলিক মানবিক সম্ভাবনার ব্যক্তিক প্রতিভূ। আমরা পৃথকভাবে এই তিন ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের দ্বারা মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত উপহার বিষয়ে আলোকপাত করে আমাদেরউপসংহারেপৌছাব।

মুসা (আঃ) ঃ 'এখানেই এবং এখনই'

ইহুদিবাদ ইহজগৎমুখী। ইহুদিবাদের সকল ধারণা ও তত্ত্ব এই পৃথিবীতেই স্বর্গ সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর। 'দি বুক অব যৌব' (The Book of Job) হল 'ন্যায় রাজ্যে'র স্বপ্নসম্ভার যা কিনা এই পৃথিবীতেই বাস্তবায়নযোগ্য–পরজগতে নয়, বরং 'এখানেই এবং এখনই'।

ইহুদিরা তাই কখনো পুরোপুরিভাবে অমরতার ধারণাকে গ্রহণ করতে পারেনি। যীশু খ্রিস্টের সময়ে স্যাডুসিসরা[১] অমরতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। মধ্যযুগের সেরা ইহুদি চিন্তাবিদ মায়মোনাইডস বলেন, অমরতা হল নৈর্ব্যক্তিক যা অমরতার ধারণাকে অস্বীকারের ইঙ্গিতবহ। আরেকজন বিখ্যাত ইহুদি দার্শনিক বেনেদিক্ত স্পিনোজা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ওল্ড টেস্টামেন্ট অমরতা সম্পর্কে কিছুই বলে না। স্পিনোজার লেখা পড়লে মনে হয়, প্রকৃতিকে যে কোন স্থানে সৃষ্টিকর্তার বদলি হিসেবে গ্রহণ করা চলে। রেনান ও তারপর বার্দিয়েভ উল্লেখ করলেন যে, ইহুদিরা অমরতার ধারণাকে গ্রহণ করতে অক্ষম, কারণ তা তাদের ইহজাগতিক মানসিকতার সাথে সঙ্গতিহীন। হাসডাই ক্রিকাস শিক্ষা দেন যে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল সৃষ্টিকর্তার 'দেহ'। এভাবে দেখা যায়, একটি বস্তুবাদী তথা জাতীয়, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ও পৃথিবীকেন্দ্রিক দর্শন ধারা জন্মলাভ করেছে ইহুদিবাদের গর্ভে– যেখানে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তা খ্রিষ্টবাদের বিপরীত চিত্রটি উপহার দেয়।

যীশু খ্রিষ্টের আগমনের পূর্বে 'খোদার রাজ্য' বিষয়ে ইহুদিরা যে বক্তব্য প্রচার করছিল তা ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক, স্বর্গকেন্দ্রিক নয়। ইহুদি ধর্মসাহিত্যে একজন মেসিয়াহ বা মুক্তিদাতার গুণ কীর্তন করা হয়েছে; ইহুদিদের নিকট এই মুক্তিদাতা যন্ত্রণা ও মৃত্যুর অধীন কোন নবী নন, বরং একজন জাতীয় বীর যিনি পছন্দমত মানুষের এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন। এভাবে "ইহুদিয় ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত ভাবনা কাঠামো অত্যাচারিত ও দুর্ভাগাদের নিকট শক্তিশালী আবেদনসহ উপস্থিত হয়। সেন্ট অগাস্টিন এই চেতনকাঠামো গ্রহণ করেছেন খ্রিষ্ট ধর্মে, মার্কস সমাজতন্ত্রে।[২] সকল বিপ্লব, ইউটোপিয়া, সাম্যবাদী ধ্যান–ধারণা ইত্যাদি পৃথিবীকেন্দ্রিক স্বর্গকল্পনা হল সত্যিকার অর্থেই ইহুদিয়–যার উৎস 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। Freemason-কৃত বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক পুনর্জাগরণের যে তত্ত্ব তাও দৃষ্টবাদী তথা ইহুদিয় চরিত্রের।

সামবার্ট–এর মতে ইহুদিবাদের ইতিহাস হল বিশ্ব বাণিজ্যিক বিকাশের ইতিহাস।[৩] প্রথম দিককার পারমাণবিক বিজ্ঞান "ইহুদিদের বিজ্ঞান" নামে পরিচিত ছিল। বিশ্ব রাজনৈতিক–অর্থনীতিও এই শিরোনাম ধারণ করতে পারে সঙ্গত কারণে। এটা কাকতালীয় নয় যে, আনবিক পদার্থবিদ্যা, রাজনৈতিক–অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্রের সেরা জনকেরা প্রায় ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহুদিজাত।

ইহুদিদের সার্বিক অংশগ্রহণ ও অবদান সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে নয়। একটি পতনোন্মুখ সভ্যতা থেকে আরেকটি উঠতি সভ্যতায় ক্রমাগত পুনর্বাসিত হয়েছে এরা। "সমগ্র মধ্যযুগে খ্রিষ্টান দেশের সংস্কৃতিতে এদের কোন প্রভাব ছিল না"[৪] বলছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। যে মুহূর্তে একটি নগরী জেগে ওঠে, ইহুদিরা সেখানে আবির্ভূত হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইহুদিদের কলোনী গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট উঠতি মহানগরীতে। প্রাচীন যুগে টায়ার, সিডন, এ্যান্টিয়াক, জেরুজালেম, আলেকজান্দ্রিয়া, কার্থেজ ও রোম; মধ্যযুগে কর্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো, সেভিলে (মুসলিম স্পেন); রেনেসাঁর প্রারম্ভে আমস্টারডাম, ভেনিস ও মার্সেই; আজকের বৃহৎ মহানগরীতে, বিশেষত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। এটি একটি প্রতীকী ঘটনা যে, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অর্থ যোগান দিয়েছিল ইহুদিরা। তাছাড়া এ রকম একটি সুযৌক্তিক তত্ত্বও রয়েছে যে, স্বয়ং কলম্বাস ইহুদি ছিলেন। আজকের আনবিক যুগের জনক আইনস্টাইন একজন ইহুদি। মোটকথা, ইহুদিরা মানবেতিহাসে বাহ্যজাগতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

www.pathagar.com

ইহুদি বস্তুবাদ বা দৃষ্টবাদ মানুষের মনকে ইহজগৎমুখী করেছে, খ্রিষ্টবাদ করেছে অন্তরাভিমুখী। 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র কঠিন বাস্তববাদ মোকাবেলা করা যেতে পারে শুধু অপর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাবাস্ত্র 'নিউ টেস্টামেন্ট' দিয়ে।

খ্রিস্টবাদ অনুযায়ী মানবিক ক্ষমতা দুই বিপরীত স্রোতধারায় অর্থাৎ একই সাথে পরকাল ও ইহকালে বিভক্ত হতে পারে না। "কোন মানুষ দুই প্রভুকে একই সাথে সেবা করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তাকে হয় একজনকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং অপরজনকে অসন্তুষ্ট করতে হবে। ··· তুমি একই সাথে খোদা ও শয়তানের সেবক হতে পার না।"[৫] টলস্টয় এই চিন্তার ওপর ভর করে বলছেন, "একই সাথে কেউ তার আত্মা ও জাগতিক বিষয়বস্তুর যত্ন নিতে পারে না। যে সহায়সম্পত্তির আশা করল সে তার আত্মাকে পরিত্যাগ করল। যে জাগতিক সম্পর্ক বিসর্জন দিতে পারে সেই আত্মাকে রক্ষা করতে পারে। অন্যথায় কেউ দুটোই পাওয়ার চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত কিছুই পায় না।" অন্যত্র বলছেন, "মানুষের দেহ বিধিনিষেধে আবদ্ধ থাকতে চায় না, তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু ধন, দৌলত, উচ্চপদ ও সুখ্যাতির মাধ্যমে মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় তা শেষ পর্যন্ত তার স্বাধীনতাকেই সীমিত করে তোলে। অধিক স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে মানুষ তার পাপাচার, রিপুলিপ্সা ও কুসংস্কার দিয়ে এক জেলখানা গড়ে তোলে যার কয়েদি সে নিজেই ··· ।"

প্রভাবশালী খ্রিস্ট তাত্ত্বিকগণ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিউ টেস্টামেন্টে'র মৌল ভাবধারার মধ্যেকার আমূল পার্থক্যের ওপর আলোকপাত করেছেন। মার্কণ্ডনীয় গোসপেল এই ধারণা দেয় যে, যীশু খ্রিস্ট মুসা (আঃ)–এর আইনকানুন নিশ্চিহ্ন করেন এবং তিনি ইহুদিদেবতা 'জেহ্‌বা'র সাথে সংশ্লিষ্ট 'ন্যায়ের খোদা' ও 'দৃষ্ট জগতের মুক্তিদাতা'র ধারণাকে অদৃশ্য জগতের স্রষ্টা প্রেমের খোদাবন্দ্–এর নিকট নিয়ে আসেন।

অতএব ধর্ম তথা খ্রিস্টবাদ ইহজাগতিক পরিবর্তন–পরিবর্ধনের ব্যাপারে প্রথম থেকেই উদাসীন। কিভাবে আত্মচৈতন্যের মধ্যে বসবাস করতে হয় সে প্রশ্নের উত্তর দেয় ধর্ম, কিভাবে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সুসমন্বিতভাবে বসবাস করতে হয়–সে প্রশ্নের উত্তর ধর্ম দেয় না। এটা পর্বতশিখরে অবস্থিত মন্দিরের মত যেখানে মানুষ আশ্রয় নেবে শয়তানের শাসনে ভারাক্রান্ত ও অসংশোধনযোগ্য পৃথিবীকে পেছনে ফেলে– সেটাই খাঁটি ধর্ম।

"তোমার জীবন ও রুটিরুজি নিয়ে চিন্তা করো না"– "তোমার ডান চোখ পাপে লিপ্ত হলে তা উপড়ে ফেল, তোমার ডান হাত পাপে লিপ্ত হলে তা কেটে ফেল।" –"যে কেউ কোন নারীর দিকে কামদৃষ্টিতে তাকায়, তৎক্ষণাৎ উক্ত নারীর সাথে তার ব্যভিচার হয়ে যায়।"[৬] – তিনি বললেন, "যার দুটো পোষাক আছে সে যেন পোষাকহীনকে একটি দান করে। যার মাংস

www.pathagar.com

আছে সে যেন মাংসহীনকে মাংস দান করে।"[৭] এখানে আপাতদৃষ্টিতে সাম্যবাদের ছোঁয়া পাওয়া গেলেও সামাজিক সম্পর্কের কোন বিশ্লেষণ নেই, শুধু মানুষ ও তার আত্মার ইঙ্গিত রয়েছে। ধর্ম বলে দানের কথা, বিপ্লব বলে গ্রহণের কথা।

ধর্ম যে পথের কথা বলে তা বড় কষ্টের এবং একনিষ্ঠ ভক্তদের জন্যেই তা নির্দিষ্ট। "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার অর্পণ করেন না।"[৮] কুরআনের এই কথা খ্রিষ্ট ধর্মের কতক অনুশীলনকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে। সকল ধর্মে দুই ধরনের পথমালা রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মীয় এলীটদের জন্যে রয়েছে কষ্টকর মহায়ানা, সাধারণ মানুষের জন্যে রয়েছে সহজতর হিনায়ানা। খ্রিষ্টবাদেও এই বিভাজন রয়েছে। পাদ্রীদের জন্যে নির্ধারিত কঠিন জীবন, যারা চিরকৌমার্যের অধীন; সাধারণের জন্যে অন্য পথ, যারা বিবাহ করতে পারে। কিন্তু খ্রিষ্টতন্ত্রে কৌমার্য সত্যিকার ধর্মনিষ্ঠা–বিবাহ এক ধরনের সমঝোতা মাত্র (দ্রষ্টব্য ১০ম অধ্যায়)। ধর্মে তাই গভীর ও নমনীয় ব্যক্তিক ব্যবস্থা সুস্পষ্ট এবং তা প্রত্যক্ষভাবে এমন কিছুই করতে পারে না যা মানুষের সামাজিক প্রেক্ষিতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সাধন শুধু প্রার্থনা ও নীতিবাক্য দ্বারা সম্ভব নয়, বরং ভাবাদর্শ ও স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত সংগ্রামের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ধর্মকে শাসকশ্রেণীর সেবাদাস হিসেবে যে গালমন্দ করা হয় তা ধর্মের শীতল, প্রতিবাদহীন চরিত্রের কারণেই। কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলেও নৈতিকভাবে সত্য নয় অর্থাৎ খ্রিষ্টবাদ ইতিহাসে শাসনযন্ত্র কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও নীতিগতভাবে তাকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থসেবক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ ধর্ম হিসেবে তা মানুষের অস্তিত্বের গভীরতম সত্যকে অনুসরণ করে; ধর্মের কাছে ইহজাগতিক তৎপরতা নয়, বরং এই বাক্যই সত্য, My kingdom is not of this world".

গোসপেলের এই চূড়ান্ত পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবেতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনা করে। মানুষ প্রথমবারের মত তার নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত হয়–এবং তা ঐতিহাসিক প্রগতির মধ্য দিয়ে নয়, বরং গুণগত ও অন্তর্নিষ্ঠ প্রভাবনার পথ ধরে। কাজেই যীশু খ্রিষ্টের আগমন পৃথিবীর ইতিহাসে এক মাইল ফলক–"a sign to the worlds"[৯] এবং পশ্চিমা সভ্যতা তার শত আবিলতা সত্ত্বেও ধারণ করে আছে খ্রিষ্ট শিক্ষার সীলমোহর।

মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ খ্রিস্টবাদের গ্রহণ ও বর্জন

আমরা আমাদের আলোচনার তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে উপস্থিত। ধর্ম পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে পারে তখনই যখন তা ইহলৌকিক ও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে কিংবা ব্যাপক অর্থে যখন তা রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়ে। ইসলাম 'জগৎসংসারায়িত খ্রিষ্টবাদ' (Islam is

www.pathagar.com

christianity re-oriented toward the world)-এই সংজ্ঞাটি খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই নির্দেশ করে।

ইসলাম একদিকে কতক খাঁটি ইহুদিয় উপাদান গ্রহণ করেছে, অপরদিকে আত্মস্থ করেছে প্রচুর অ-ইহুদিয় উপাদান। ধর্মের শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে হেগেল ইসলামকে ইহুদিবাদের প্রত্যক্ষ ধারাবাহকরূপে দেখেছেন-যে ধারণাটি তাঁর নিজস্ব খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। একইভাবে স্পেঙ্গলার 'বুক অব যৌব'কে বলছেন একটি ইসলামী দলিল। এদিকে মারসিয়া এলিয়াড তাঁর 'Patterns of Comparative Religion' বইয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানব জাতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ক্রান্তিলগ্নে স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে মানব মনের ইতিহাস ক্রমাগত ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অগ্রসরতার ইতিহাস। তৃতীয় পর্যায়, যা এখনও শেষ হয়নি, আরম্ভ হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে। এ প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্থান ধর্ম তথা খ্রিস্টবাদ ও নব্য ধর্মনিরপেক্ষতার মাঝখানে এবং এভাবে তিনি ঐতিহাসিক ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন (অর্থাৎ এই পর্ব শেষ হলে আসবে পূর্ণাঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষতার যুগ)।

কিন্তু আমরা এলিয়াডকৃত ইতিহাসের এই একরৈখিক বিন্যাসকে গ্রহণ করতে পারিনে। আমরা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চিরকালীন মধ্যম অবস্থানকেই পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। আমাদের এই দাবি নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা আরও পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত হবে। ভণ্ড আচারনিষ্ঠ, তার্কিক, ধর্মীয় লেখক (Jewish Scribe), অল্পবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের নগরী বলে যীশু খ্রিস্ট জেরুজালেম নগরী পরিত্যাগ করেন। এদিকে সমাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতা গ্রামবাসীদের সাথে নয়, বড় বড় নগরীর জনসাধারণের সাথে। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন ঠিকই, অথচ উচ্ছন্নে যাওয়া মক্কা নগরীতে তাঁর মিশন সফল করার জন্যে ফিরে এসেছেন আবার।

কিন্তু মক্কা ইসলামের জন্মনগরী নয়; ইসলাম তার পরিপূর্ণতা মদীনাতেই অর্জন করে। হেরা গুহায় মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন উপবাসী, সন্ন্যাসী, সুফী সাধক; মক্কাতে এসে হলেন ধর্মের বাণীবাহক-অতঃপর মদীনাতে এসে হলেন ইসলামের প্রবর্তক। মদীনাতেই ইসলাম চেতনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছতর হল।[১০] মক্কা নয়, মদীনাতেই ইসলামের সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থাপনার শুরু।[১১]

এই যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হেরা গুহায় অবস্থান অতঃপর বাস্তবতার জগতে প্রত্যাবর্তন-এ পর্যায়েই পারমার্থিকতা ও যুক্তি, ধ্যান ও কর্মনিষ্ঠার মিলন সম্পন্ন হল। কাজেই মরমীবাদ দিয়ে ইসলামের শুরু, রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে তার পরিপূর্ণতা। 'ধর্ম' বাস্তবতাকে গ্রহণ করল এবং পরিণত হল ইসলামে। মানুষ ও আত্মার সাথে যথাক্রমে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং যীশু

www.pathagar.com

খ্রিস্ট ও বাইবেলের সামঞ্জস্য। "পবিত্র গ্রন্থ ও আত্মার প্রকৃতি একই। সারবত্তীয়ভাবে তারা একই রহস্যের প্রতিবেদক।"[১২] কিন্তু ইসলাম হল মানুষেরই পুনরাবৃত্তি। মানুষের মতই এর রয়েছে "স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ", একই সাথে তা জীবনের গদ্যরচনাও বটে। ইসলামের এমন অনেক দিক রয়েছে যা স্বভাবতই কবি ও রোমান্টিকরা পছন্দ করবেন না। কুরআন বাস্তবতার ক্ষুদ্রতম অণুকেও তুলে ধরে–মানুষকে সংশ্লিষ্ট করেই তার সকল প্রস্তাবনা।

প্লেটোর আইডিয়া, লাইবনিজের মনেডস এবং খ্রিস্টবাদের স্বর্গদূত একই অন্তর্জগতকে তুলে ধরে, শোনায় শাশ্বত, সুন্দর ও অনড় এক জগতের কথা। কিন্তু ইসলাম একরৈখিকভাবে এই জগতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে না। মানুষের নিকট, যাকে সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখানোর মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন,[১৩] ফেরেশতার নতজানু হওয়াটা শাশ্বত বিশুদ্ধতার ভাবনার ওপরে মানুষ এবং মানব জীবনের গুরুত্বকেই প্রমাণিত করে।

খ্রিস্টবাদ কখনো এক খোদার ধারণায় স্থিত হতে পারেনি। সেখানে দৈব বিষয়ে জীবন্ত চিত্র থাকলেও খোদা সম্পর্কে কোন পরিচ্ছন্ন প্রস্তাবনা নেই। মুহাম্মদ (সাঃ)–এর মিশন ছিল খোদার গোসপেলিয় ভাবমূর্তিকে পরিষ্কার করে খোদাকে মানবিক মন ও চিন্তার সান্নিধ্যে আনা। গোসপেলে খোদা হলেন পিতা, কুরআনে প্রভু; খ্রিস্টানরা খোদাকে ভালবাসেন, মুসলিমরা খোদাকে শ্রদ্ধা করেন। মা মেরী ও অন্যান্য সাধুর প্রতি যে দেবতুল্য ভক্তি নিবেদন করা হয়, ইসলামে তা সম্ভব নয়। ইতিহাসের সমস্ত ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করেও ইসলাম স্বচ্ছতম একেশ্বরবাদী ধর্মই রয়ে গেছে।

খ্রিস্টবাদে খোদা পরিপূর্ণভাবে আত্মার সাথে যুক্ত, সেখানে শয়তান (লুসিফার) হল বস্তুজগতের রাজা।[১৪] এ কারণে খ্রিস্টানরা ইহজগৎকে শর্তহীনভাবে পরিত্যাগ করে অন্য জগতের সাথে আত্মীয়তা করতে চেয়েছে। কিন্তু ইসলামে বাহ্যভাবনা সমুন্নত। 'আল্লাহ আকবর' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূল আল্লাহ' –ইসলামের দুই বৈপ্লবিক পরিবেশনা সাইয়েদ কুতুব–এর মতে "বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিপ্লব"। এবং "এগুলোর অর্থ মোল্লাতন্ত্র, গোত্রপতি, ধনিক শ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া, অতঃপর খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।" কাজেই জনাব কুতুব উপসংহার টানছেন এই বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই"– এই কথাটি সকল কালের ও দেশের ক্ষমতাসীনদের নিকট বিতৃষ্ণাজনক।

খ্রিস্টবাদ মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক চিত্রকে উপস্থাপিত করতে পারেনি। যীশু খ্রিস্ট হয়েছেন ঈশ্বর–পুত্র; কিন্তু ইসলাম মুহাম্মদ (সাঃ)–কে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মানে। কুরআনেও বলা হচ্ছে, মুহাম্মদ একজন মানুষ মাত্র।[১৫] এবং এই স্বাভাবিক ধারণা থেকে বিচ্যুতির আশঙ্কা নষ্ট করা হচ্ছে এই কথা বলে, "ইনি কেমনতর অবতার যিনি খাদ্য গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন এবং রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যান · · · · ·।"[১৬] গোসপেলে মার্থা ও মেরীর ওপর দেবীত্ব আরোপিত হয়েছে, ইসলামে নারী তার স্বাভাবিক চরিত্র স্ত্রী ও মাতারূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

গোসপেল ও কুরআনে ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের একটি সার্বিক তুলনা করলেও ধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্যটি ধরা পড়ে। গোসপেলগুলোতে যে সমস্ত শব্দ ঘন ঘন পাওয়া যায়, তা এরকম ঃ আশীর্বাদপুষ্ট, স্বর্গ, স্বর্গপ্রাপ্ত, পবিত্র, স্বর্গচ্যুত, ভণ্ড, পাপ, প্রেম, অনুতাপ, ক্ষমা, রহস্য, দেহ (পাপের বাহকরূপে), আত্মা, বিশুদ্ধকরণ, মুক্তি ইত্যাদি। অন্যদিকে কুরআনে এই ধরনের শব্দ তুলনামূলকভাবে বেশি আসছেঃ প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, সামর্থ্য, কেনাকাটা, চুক্তি, লেখালেখি, অস্ত্রপাতি, যুদ্ধ, সৈন্য বাহিনীর অবস্থান, বল প্রয়োগ, সংগ্রাম, বাণিজ্য, ফলমূল, সতর্কতা, শাস্তি, ন্যায় বিচার, প্রতিশোধ, চিকিৎসা, মুনাফা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

'Religious literature' বলতে ইওরোপে যা বোঝা হয়, ইসলাম তা নয়; আবার আমূল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামে অপ্রবেশ্য। প্রত্যেক ইসলামী চিন্তাবিদ একজন ধর্মতাত্ত্বিকও বটেন, যেমন প্রতিটি সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে।[১৭]

একই উপসংহার টানা যেতে পারে একটি মসজিদ ও একটি গীর্জার তুলনা থেকে। মসজিদে বুদ্ধিচর্চার আবহ বর্তমান, গীর্জায় বর্তমান রহস্যময়তার আবহ। একটি মসজিদ কোন কর্মস্থলে, কোন বাজার বা বসতির কেন্দ্রে অবস্থিত। মসজিদে নামাজের পর কতক জাগতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু চার্চ বাস্তবতার অনুষঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চায়।[১৮] এখানে আনুষ্ঠানিক নীরবতা, অন্ধকার তথা অতিন্দ্রীয় জগতের অনুভব নির্মাণের প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট।

পোপের অকাট্যতার নীতির সাথে ইসলামের 'ইজমা'র তুলনা করুন। মুহাম্মদ (সাঃ) বলছেন, "আমার উম্মতেরা কোন ভুল সিদ্ধান্তে একমত হতে পারে না।" গোসপেল দৃষ্টি ফেরায় ব্যক্তির দিকে, কুরআন জনগণের দিকে। প্রথমটি অভিজাততন্ত্র, ভাবগাম্ভীর্য ও সন্ন্যাসবৃত্তির অনুবর্তী, কিন্তু অপরটি সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে অভিজাততন্ত্র তৈরি করতে চায় না; এখানে কতক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের জন্যে দুই রাস্তা নয়। গণতন্ত্র এখানে সুস্পষ্ট।[১৯]

যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম এসেছে তার একটি বিবরণও ইসলামকে বোঝার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। প্রাক-ইসলামী আরবরা রাজনীতি, বাণিজ্য ও আধ্যাত্মিকতা-সবক্ষেত্রেই সপ্রাণ ছিল। কাবাঘর শুধু ধর্মচর্চার স্থান ছিল না, যুগ যুগ ধরে তা একটি বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল। খ্রিষ্টবাদের উর্বর জন্মভূমি গ্যালিলিতে অল্প প্রচেষ্টাতেই জীবন নির্বাহ সম্ভব ছিল, কিন্তু আরবভূমিতে জীবন নির্বাহ করতে হত অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। একই সাথে এই মরুভূমিই তাদের মধ্যে গভীর ধর্মবোধ জাগ্রত রেখেছিল। এই দুই বিপরীতধর্মী

www.pathagar.com

প্রপঞ্চের ধারক আরবরা তাই ইসলামের মাতৃজাতি হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে যায়। গোসপেল বলতে পারে, "পুকুরে ফোঁটা পদ্মের মত বেঁচে থাক।" কিন্তু কুরআনে বলা হচ্ছে, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে দিবস সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা সংগ্রহের জন্যে ছড়িয়ে পড়তে পার।"[২০]

গোসপেল থেকে নয়, কুরআন থেকেই আমরা জানতে পারি, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবীর প্রভু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[২১] শুধু জ্ঞান ও কর্ম, তথা বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে। এই বাস্তবতার সাথে আইন ও ন্যায়ের ধারণার সংযোগে ইসলাম প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম সংস্কৃতিই চায়নি, সভ্যতাও চেয়েছে।

সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র হল সাক্ষরতা বা শিক্ষা। ইসলাম পূর্বাপর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনের প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।[২২] লেখালেখির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; দীর্ঘ সময় ধরে গোসপেল মৌখিক ঐতিহ্য হিসেবে বিরাজিত ছিল এবং যতটুকু জানা যায়, তা লিখিত রূপ পেয়েছে যীশু খ্রিষ্টের পর পুরো একটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হওয়ার পর। বিপরীতক্রমে মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা উপস্থিত লেখকদেরকে বলতেন এবং তাঁরা তা লিখে নিতেন।– যীশু খ্রিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এই পদ্ধতি যে খাপ খায় না তার প্রমাণ এই যে, তিনি ইহুদি ধর্মসাহিত্য লেখকদের (Scribes) ঘৃণা করতেন।[২৩]

কুরআনে অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে আদেশ রয়েছে তা ধর্মীয় প্রস্তাবনা নয়।[২৪] অহিংসা ও অপ্রতিরোধের নীতিই ধর্মের অনুষঙ্গী। বিশুদ্ধ ধর্মগুলোর এ নমনীয় নীতিগুলো আসছে খ্রিষ্ট শিক্ষা ও ভারতীয় ধর্মগুলোর নিকট থেকে। গান্ধীর সত্যাগ্রহ এই ঐতিহ্যের ধারাবাহী। কুরআন যখন অত্যাচারিত নিপীড়িত হওয়ার পরিবর্তে সংগ্রাম করার কথা বলছে[২৫] তা কোন ধর্মীয়–নৈতিক কোড হিসেবে নয়, তা আসছে একটি রাজনৈতিক–সামাজিক ধারণা হিসেবে। মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন যোদ্ধা; তাঁর ছিল নয়টি তলোয়ার, তিনটি বল্লম, সাতটি বর্ম, তিনটি ঢাল এবং অন্যান্য অস্ত্র। এই প্রেক্ষিতে তাঁর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'যোদ্ধা পয়গম্বর' হযরত মুসা (আঃ)–এর।[২৬]

ইসলামে মাদকদ্রব্যে যে নিষেধাজ্ঞা তা প্রাথমিকভাবে সামাজিক ভাবনাপ্রসূত। সাধারণত ধর্মের সাথে মাদকদ্রব্যের কোন বিরোধ নেই। অনেক ধর্মে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে মাদকদ্রব্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। খ্রিষ্টানদের নিকট মদ হল যীশু খ্রিষ্টের রক্ত। ইসলামী শিক্ষায় এভাবে বলা হয়নি যে, মদ্যপান একটি পাপ, অতএব তা হারাম, বরং ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে। এখানে বিজ্ঞানের অনুষঙ্গ আসে। দুই বৈপরীত্যের ঐক্য হিসেবে ইসলামের এই অনুপম চিত্রটিকে অনেকেই ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছেন শুধু এর ধর্মীয়

www.pathagar.com

চরিত্রকে সমধিক গুরুত্ব দানের মাধ্যমে। ধর্মীয় দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেওয়ার অর্থ ইসলামকে মরমীবাদে পরিণত করা। ইসলামকে বাস্তব কর্মকাঠামো থেকে বিচ্যুত করা হলেই পৃথিবীর ওপর তার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়।[২৭] ইসলামী রাষ্ট্র তখন অপরাপর সকল রাষ্ট্রের মত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রযন্ত্রে আবির্ভাব ঘটে নগ্ন ক্ষমতাধারীদের, অপরদিকে সমাজ চালিত হয় অকর্মণ্যতা ও পশ্চাদ্‌পদতার দিকে। অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনায়ক, নাস্তিক বৈজ্ঞানিক, কাঠ মোল্লা, দরবেশ ও সুফীবাদী, মাতাল কবি–এঁরা হলেন ইসলামের অন্তর্গত ঐক্যে ফাটল বা ভাঙনের উৎপাদন। খ্রিষ্ট ফর্মুলাতে তো বলাই হয়েছে : "Render unto God that which is God's and unto Caesar that which is Caeser's. সুফীদর্শন মৌলিক অর্থেই এই বিচ্যুতির আদর্শ উদাহরণ যাকে বলা যেতে পারে ইসলামের খ্রিষ্টীয়করণ, অন্য কথায় মুহাম্মদ থেকে যীশুর দিকে প্রত্যাবর্তন।[২৮]

নিজস্ব অনুপম ফর্মুলার দ্বারাই ইসলাম ইওরোপসৃষ্ট সমাজতন্ত্রের আগ্রাসন প্রতিরোধ করেছে। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার ডন কুইক্‌সোটিক (Don Quixote-esque) খ্রিষ্টবাদ বামপন্থী বাস্তবতাকে রুখে দিতে পারেনি; কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা কোন দুর্ঘটনা নয়; তা ইসলামী দেশগুলোতে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কারণ ইসলামের নিজস্ব 'মার্কসবাদ' রয়েছে।

খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা উপেক্ষিত হয়েছে। ইসলাম যে বাইবেলকে পবিত্র গ্রন্থ ও যীশু খ্রিষ্টকে খোদার পয়গম্বর হিসেবে মেনে নিয়েছে তা অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। এ ব্যাপারটি আমাদের উপরোক্ত আলোচনার অনুষঙ্গে, এই দুই বিশ্বধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃনির্ণয়পূর্বক ভবিষ্যতের জন্যে এক সম্পূর্ণ নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে।[২৯]

www.pathagar.com

টীকা

১. মুসা ও অভিজাততান্ত্রিক ইহুদি ধর্মকানুনের একনিষ্ঠ ভক্তগোষ্ঠী এবং খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের ইহুদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক–ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. Bertrand Russell : The History of Western Philosophy, London, 1946, P. 383.

৩. Sombart : Les Jufis dans la vie economique.

৪. Bertrand Russell : ibid., P. 342.

৫. St. Matthew 6 : 24.

৬. সকল উদ্ধৃতি গোসপেল থেকে।

৭. St. Luke, 3 : 10-11.

৮. The Qur'an 2 : 286.

৯. The Qur'an 21 : 91.

১০. "আজ আমি তোমার দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ রহমাত তোমার ওপর নাযিল করলাম। আমি সন্তুষ্ট যে ইসলামই তোমার দ্বীন"– মাদানী সূরা ঃ কুরআন।

১১. Stefano Bianco : Polvalence and Flexibility in the the Structure of the Islamic City, WERK, Switzerland, 9/1976.

১২. Henri de Lubac : Introduction a Origene.

১৩. The Qur'an, 2 : 30.

১৪. কতক খ্রিষ্টান কিংবদন্তী আমাদেরকে শয়তানের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কথা জানায়।

১৫. The Qur'an 17 : 93, 18 : 111, 40 : 6.

১৬. The Qur'an 25 : 7.

১৭. দর্শন– ধর্মতত্ত্ব–আইন–চিকিৎসাশাস্ত্র– এই পরম্পরাটি এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে বোঝার জন্যে। Ernst Bloch যোগ করছেন, "Almost all Arabic theologians were also doctors." Natural Law and Human Dignity, Beograd, P. 58.

১৮. St. Bernard নগরী থেকে যতটা সম্ভব দূরবর্তী স্থানে চার্চ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। Clark : Civilization.

১৯. খ্রিষ্টীয় ব্যবস্থাপনা শুধু পোপ দ্বারা নয়, বরং সামষ্টিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হবে– দ্বিতীয় ভ্যাটিকান সম্মেলনে উত্থাপিত এই দাবি স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাত হয়।

www.pathagar.com

২০. The Qur'an 49 : 10 এবং Saint Matthew's Gospel 12 : 47-49.

২১. The Qur'an 2 : 30.

২২. The Qur'an 96 : 1.

২৩. হযরত মুসা (আঃ)–এর সাথে লেখালেখির সম্পর্ক সুস্পষ্ট– যা পৃথিবীতে তাঁর জন্যে নির্ধারিত মিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। Numbers 33 : 2, Romans 10 : 5.

২৪. The Qur'an 42:39.

২৫. The Qur'an 2:216, 22:39, 60:2, 8-9, 61:10-11.

২৬. আমরা মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) তথা ইহুদিবাদ ও ইসলামের মধ্য অন্য অনেক ক্ষেত্রে সমরূপতা পাই। ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদের মধ্যে এই সমরূপতা অনুপস্থিত। এক অর্থে, এই দুই শিক্ষার সম্পর্ক thesis-antithesis সম্পর্কের অনুরূপ। এই তথ্যটি অধিকাংশ খ্রিস্টান দেশে 'anti-Semiticism'-এর প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে পারে।এবং anti-Semitic অনুভূতি মুসলমানদের মধ্যে অনুপস্থিত।

২৭. The Qur'an 2:77.

২৮. বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ পর্যায়ে আমাদের স্মরণে সেই সব দরবেশী আচরণ রয়েছে যা সম্পূর্ণত জীবনের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেয়। গভীর ধর্মবোধের কথা যদি বলা হয়, তাহলে বলতে হয়, প্রত্যেক মুসলিমই এক একজন সূফী ও অন্য কারো সূফী হওয়ার আগেই মুহাম্মদ (সাঃ) সূফী হয়েছিলেন।

২৯. "এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।" কুরআন (২৯ঃ৪৬) এবং "হে কিতাবীগণ! এসো সেই কথকতায় যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে একই বার্তা প্রদান করে। ··· (৩ঃ৬৪)।

www.pathagar.com

ইসলাম ও ধর্ম

পঞ্চতন্ত্রের দ্বৈততা

'সালাত' শুধু ইসলামী বিশ্ববীক্ষার প্রকাশ নয়, ইসলাম কিভাবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তারও একটি প্রতিফলন।

কতক খ্রিষ্টান ও হিন্দু সন্ন্যাসতত্ত্বে প্রার্থনা চলতে পারে 'পবিত্র অপরিচ্ছন্নতা' (Holy Uncleanliness) সহকারে। এই চিন্তা অনুযায়ী শরীরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা আধ্যাত্মিকতার শেকড়কে শক্ত করে তোলে।[১] কিন্তু শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সালাত অর্থহীন। ওযু ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন সালাতের বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি তুলে ধরে। এগুলো সহযোগে সালাত একটি প্রার্থনা বা রহস্যময়তা নয় শুধু, শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যসচেতনতাও বটে। শীতের সকালে মিষ্টি ঘুম তাড়িয়ে শীতল পানিতে ওযু করার মধ্যে সামরিক কর্মকাণ্ডের ছোঁয়া রয়েছে। কাদেশীয়া যুদ্ধের পূর্বে কতক অগ্রবর্তী পারসিক সৈন্যদের নেতা দূরে নামাজরত মুসলিম সৈন্যদের দেখে বলেন, "ঐ দেখ, মুসলিমরা তাদের সামরিক রুটিন পালন করছে।"[২] সালাতের বাহ্যিক চিত্রটি কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির যা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যায়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভোর থেকে রাত্রি অবধি পাঁচবার ওযুসহ সালাত বাস্তবিকই আয়েস, বিলাস ও কামুকতার বিরুদ্ধে এক কার্যকর বাঁধা। পাশাপাশি কুরআনে বলা হচ্ছে, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।"[৩] ধর্মবিশ্বাসের সাথে এই যে শারীরিক সমন্বয় তা একমাত্র ইসলামেই লভ্য; অন্য যে কোন ধর্মে শরীর গুরুত্বপূর্ণ নয় ("Out of grace")।[৪]

সালাতের নির্দিষ্ট সময়সূচিএবং নির্দিষ্ট কেবলার সময় সংকেত ও প্রকৃতিমুখীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সালাত রোযা ও হজ্বের মতই কতক জ্যোতির্বিদ্যক সংঘটনার ওপর নির্ভরশীল এবং কার্যত তা কালিক ও বৈশ্বিক চেতনায় স্থিত। নবীন ইসলামে জ্যোতির্বিদ্যার দ্রুত বিকাশের মূলে কাজ করেছে স্থান ও কালের নিখুঁত সংজ্ঞাচিত্র প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

সালাত শুধু সাধারণ প্রার্থনা নয়, বরং তাৎক্ষণিক পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমও বটে-ফলত তা ঋণাত্মক ব্যক্তিবাদ ও বিচ্ছিন্নতার বিরোধী। জীবনের তাগিদে মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, মসজিদ তাদেরকে আবার একত্র করে এবং সমঝোতা, সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার পাঠশালা হিসেবে কাজ করে। সালাতের সামাজিক প্রবণতা পূর্ণতা লাভ করে শুক্রবারের জুমার নামাজের মাধ্যমে। এখানে একটি নাগরিক ও রাজনৈতিক আবহ রয়েছে। খুৎবা প্রথমত একটি রাজনৈতিক বাণী। খ্রিষ্টানরা একে খাঁটি প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিহীন ভাবতে পারে, কিন্তু ইসলামী প্রেক্ষাপটে এটাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম।

www.pathagar.com

ইসলামে ধর্মের রূপান্তর (metamorphosis) যাকাত প্রবর্তনের মধ্য দিয়েও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। ইসলামের শৈশবে যাকাত স্বতঃস্ফূর্ত দান তথা এক ধরনের ভিক্ষা হিসেবে গণ্য ছিল। মদীনাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল একটি খাঁটি আধ্যাত্মিক সমাজের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে যাকাতকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় (ধনী কর্তৃক গরীবকে) ট্যাক্স হিসেবে বিবেচনা করলেন। যতটুকু জানা যায় ইতিহাসে এটাই এ ধরনের প্রথম ট্যাক্স। খ্রিষ্টানদের ঐচ্ছিক সাহায্য দানের নিয়মের সাথে বাধ্যবাধকতা যুক্ত করে ইসলাম সৃষ্টি করল যাকাত যাকে রিসলার বলছেন "Obligatory Charity"—যে দর্শন সাধারণ প্রার্থনাকে 'সালাতে' পরিণত করেছে, সেই দর্শনই ভিক্ষা প্রদানকে 'যাকাতে' পরিণত করে– ফলত ধর্মের উত্তরণ ঘটল ইসলামে।

যাকাতের ঘোষণার সাথে সাথে ইসলাম সামাজিক আন্দোলনে প্রবেশ করল, শুধু আর ধর্ম হিসেবে কার্যকর থাকল না। মুসলিমরা মদীনায় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত হওয়ার পর যাকাত তার সত্যিকার গুরুত্ব অর্জন করে। এই বিশেষ দিকটির প্রতিফলন পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে, কুরআনে মাক্কী সূরাতে ৮ বার এবং মাদানী সূরাতে ২২ বার যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য সমস্যাই শুধু নয়, পাপও বটে। সম্পত্তি হস্তান্তর থেকেই এ সমস্যার সমাধান হয় না, বরং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সদিচ্ছা ও শুভাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সমস্যার নিরাকরণ সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন হলেও যদি মানুষের মধ্যে ঘৃণা, শোষণ ও অপরকে অধীনস্থ করার মানসিকতা কাজ করে, তাহলে দারিদ্র্য কোনদিন ঘুচবে না। এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে যাকাতের মাধ্যমে।[৫] প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইসলামের উদ্দেশ্য ধনের অপসারণ নয়, কৃপণতার অপসারণ।

ইসলামে দান–ভাবনার আরেক রূপ হল ওয়াক্‌ফ, যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। এই ওয়াক্‌ফ (নৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে বস্তুগত দ্রব্য ও সম্পত্তির স্বতঃস্ফূর্ত দান)–এর ধারণা অন্য কোন সমাজে নেই। ইসলামী জগতের এমন কোন সমাজ নেই যেখানে গণস্বার্থে বিরাট সম্পত্তির কোন না কোন দান সম্পন্ন হয়নি। ওয়াক্‌ফ প্রমাণ করেছে, বস্তুগত স্বার্থ ছাড় দিয়েও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ সম্ভব। এটা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে anamoly মনে হতে পারে ; কিন্তু 'আত্মা ও অর্থনীতি' সহযোগে সৃষ্ট এই ব্যবস্থা মৌলিকভাবেই ইসলামী।

সালাত আধ্যাত্মিক, যাকাত সামাজিক। সালাত মানুষের দিকে স্থিত, যাকাত বিশ্বের দিকে। স্বভাবতই প্রায় সকল ইসলামী চিন্তাবিদ সালাত ও যাকাতকে পরস্পরনির্ভর দুই বাস্তবতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এমন মতও ব্যক্ত হয়েছে যে, যাকাত ছাড়া সালাত অর্থহীন।

www.pathagar.com

এই চেতনা বিশ্বাসের সাথে কর্মের এবং মানুষের সাথে পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতার ধারাকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃত একটি উপজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর মধ্যে এই বোধটিই কাজ করেছিল। বলা হয়ে থাকে, এই উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "আমি শপথ করে বলছি যে, যে কেউ সালাত ও যাকাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনতে চায় আমি তার বিরুদ্ধে জেহাদ করব।"– কুরআনে ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি "সালাত আদায় কর, যাকাত দাও"– বিশ্বাস ও সৎকর্মযোগে ইসলামের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাবনারই স্মারক।[৬]

কলেমা বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, যার মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষা নেওয়া হয়। এখানেও দ্বৈততা কাজ করছে। একদিকে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ে যোগদান করা হয়, যার জন্যে কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই, অপরদিকে সামাজিক–রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে ইসলামে দীক্ষা নেওয়া হয় কলেমা পাঠের মাধ্যমে, আনুষ্ঠানিকতা সহকারে। এখান থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, নবদীক্ষিত ব্যক্তি শুধু নৈতিক নয়, আইনগত বাধ্যবাধকতারও অধীন।

একই ব্যাপার লক্ষণীয় সিয়াম সাধনার ক্ষেত্রে ও। এটা শুধু তাত্ত্বিক আদেশ পালন বা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ নয়, এখানেও সামাজিক অনুষঙ্গ আসছে। একজন দরিদ্র কৃষকের ঘরে যেমন, তেমনি দেশের কর্ণধারের প্রাসাদ, দার্শনিক বা শ্রমিকের ঘরেও সমানভাবে পালিত হচ্ছে সিয়াম।

হজ্বের ব্যাপারে আমরা কি বলব? এটা কি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নাকি রাজনৈতিক সমাবেশ? এটা a la Islam— এক কথায় একের মধ্যে সব।

কুরআনের এই আয়াতটি পড়ুন ঃ "(মিথ্যে শপথের) প্রায়শ্চিত্ত এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে, যে খাদ্য সাধারণত তোমরা সপরিবারে খাও অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা দাস মুক্ত করে দাও। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে ব্যক্তি তিন দিন রোজা রাখবে।" (৫ ঃ ৮৯) এখানে বাস্তব ব্যবস্থাপনা আগে আসছে, তারপর ধর্মীয় অনুষঙ্গ।[৭]

ওল্ড টেস্টামেন্ট বলছে প্রতিশোধের কথা, নিউ টেস্টামেন্ট বলছে ক্ষমার কথা। দেখুন কুরআন কিভাবে সমন্বয় ঘটাচ্ছে ঃ "আঘাতের প্রতিদান তো আঘাতই। কিন্তু যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে।" (৪২ ঃ ৪০) কিংবা "আমি এ গ্রন্থে (তওরাত) তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে যখম। কিন্তু যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়।" (৫ ঃ ৪৫) কিংবা "হে মুমীনগণ,

www.pathagar.com

তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (৫ ঃ ৮৭)

ইসলাম মানুষকে পৃথিবীর নেয়ামত থেকে দূরে রাখতে কিংবা অসংখ্য বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বাঁধতে চায় না। ইসলাম পৃথিবীকে অভিশাপগ্রস্ত হিসেবেও চিহ্নিত করে না, বরং পানির অভাবে ওযুর জন্যে পানির বিকল্প হিসেবে মাটি ব্যবহারের ব্যবস্থাও (তায়াম্মুম) রয়েছে।

ইসলামে এই দ্বৈতধারার মিলনকে স্থাপত্যকলার উদাহরণযোগেও যাচাই করে নিতে পারি। স্থাপত্যকলা[৮], কেনেথ ক্লার্ক-এর ভাষায় 'less pure art' বা general art. বিশুদ্ধ শিল্প (যেমন সঙ্গীত) ব্যক্তি অভিমুখীন। কিন্তু স্থাপত্যকলা শিল্প ও প্রযুক্তির চমৎকার ভারসাম্যমূলক সমন্বয়, যেখানে শিল্পস্বাদ গ্রহণের পাশাপাশি ব্যবহারিক মানবিক প্রয়োজনও পূরণ হয়। স্থাপত্যকলার এই চরিত্রই একে আক্ষরিক অর্থে একটি ইসলামী শিল্প হিসেবে রূপ দিয়েছে। ইসলামের মতই এর রয়েছে মন ও শরীর। স্থাপত্যকলায় ইসলামের অসাধারণ অবদান তাই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এটাই স্বাভাবিক।

ইসলামের উৎসেও এই দ্বৈততার প্রতিফলন রয়েছে। দুটো মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদিস-এদের প্রতিটি উপস্থাপন করছে অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা, শাশ্বত ও খণ্ডিত সময়ের অনুভাবনা, চিন্তা ও কর্ম, ধারণা ও জীবনের পূর্ণ চিত্র। ইসলাম যতটা চিন্তনের তার চেয়ে বেশি কর্মের। কুরআন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, হাদিস তথা ব্যবহারিক জীবন ছাড়া কুরআন বোঝা যাবে না। হযরত মহাম্মদ (সাঃ)-শুধু এই একটি জীবনের ব্যাখ্যা থেকেই ইসলাম প্রতিভাত হচ্ছে একটি উপযোগী দর্শন ও জীবনভিত্তিক প্রযোজনারূপে। তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজ্‌মাও একই চিত্র উপহার দেয়। ইজমা কতক নির্দিষ্ট শরীয়তী বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতদের ঐকমত্য। এখানে একই সাথে গুণগত (elitist) ও সংখ্যাগত (democratic) দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এই দ্বৈততার আরেক রূপ দেখা যাবে মক্কা নগরী ও হেরা গুহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করলে। কারণ তা ইসলামের উষালগ্নেই বাস্তবতা ও অন্তর্জগৎ, কর্মকাণ্ড ও ধ্যানের মধ্যকার সমন্বয়কে তুলে ধরে। এখানে একটি আধ্যাত্মিক ও একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা মদীনার রাষ্ট্রকাঠামোতে এই দুই ধারার মধ্যকার সমন্বয়কে মসৃণভাবে উদ্ভাসিত করে তোলে।

শেষতক, আল্লাহর রাস্তায় নিহত বা শহীদদের কথা বলা যায় যাঁরা একাধারে সাধক ও যোদ্ধা। খ্রিস্ট ধর্মে যা বিভক্ত হয়েছিল সন্ন্যাসবৃত্তি ও বীরত্বে, ইসলামে তা আবার একত্রে গৃহীত হল 'শহীদ'-এ। এটা রক্ত ও মনের মধ্যকারই চমৎকার ঐক্য।

www.pathagar.com

কুরআন পুনঃপুনঃ তার দ্বিমাত্রিক দাবির কথা জানিয়ে আসছে অর্থাৎ গভীর অনুধ্যান ও পর্যবেক্ষণ তথা ধর্ম ও বিজ্ঞান–উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইসলামে।

কুরআন রেডিমেড বৈজ্ঞানিক সত্যকে সংশ্লিষ্ট করে না, পরিবর্তে তা বিজ্ঞানের অপরিহার্য প্রেক্ষাপটকে আলোকিত করে–এ ব্যাপারটি ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাভাবিক। কুরআন প্রকৃতির অসংখ্য ব্যবস্থাপনার দিকে নির্দেশ করে মানুষকে সেদিকে ফেরাতে চায়। কুরআনের প্রথম আয়াতই[৯] বিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক মন্ত্র। মানুষ যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও অধিগত করে তা তারই নির্মাণ নয়, তা স্রষ্টার বিশাল শিল্পকর্ম। সে কারণে এই পর্যবেক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক, ঔদাসীন্যে ভরা ও আকাঙ্ক্ষাহীন হতে পারে না। এখানে বৈজ্ঞানিক উৎসাহ এবং ধর্মীয় গুণমুগ্ধতার সংশ্লেষ বাঞ্ছনীয়। কুরআনের প্রকৃতি বিষয়ক আলোকপাত, যা কখনো কখনো ভীষণ কাব্যময়, এই প্রবণতাকেই প্রস্ফুট করে।

আসুন লক্ষ্য করি,

"নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী ; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্যে রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলে অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে।" (৬ ঃ ৯৫–৯৮)

"তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে। তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যে সব রঙ–

www.pathagar.com

বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে। তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার কর।" (১৬ ঃ ১০-১৪)

"আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন ; তদ্দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরি করে থাক। এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন ঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ ও উঁচু ডালে গৃহ তৈরি কর, এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার ঐ মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (১৬ ঃ ৬৫ - ৬৯)

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র।। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।" (২১ ঃ ৩৩)

আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার। এইসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।" (২২ ঃ ৪৫-৪৬)

"তারা কি ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বস্তু কত উদ্গত করেছি!" (২৬ ঃ ৭)

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল যারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলেন।" (৩০ ঃ ৯)

www.pathagar.com

তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না– আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্র নেই। ভূমিকে বিস্তৃত করেছি। তাতে পর্বতমালার ভার আমি স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। এটা জ্ঞান আহরণ এবং স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে। আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা বাগান ও শস্য উদ্‌গত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।" (৫০ ঃ ৬–১১)

তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে ওপরে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে সমতল করা হয়েছে? তোমরা যে বীজ বপন কর (৫৬ ঃ ৬৩), ··· তোমরা যে পানি পান কর (৫৬–৬৮) ··· তোমরা যে আগুন জ্বালাও ···।" (৫৬ ঃ ৭১)

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব–জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে– নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।" (২ ঃ ১৬৪)

প্রকৃতিলগ্ন এই আয়াতগুলো সম্পূর্ণরূপে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে নির্মাণ করেছে, যেখানে প্রকৃতির সাথে বিন্দুমাত্র বিরোধিতা নেই। ইসলামে সুন্দর ও মহতী কর্মচেতনার সাথে বস্তুর সংযোগ ঘটানো হয়েছে (যেমনটি সালাতের সাথে দেহকে, যাকাতের সাথে সম্পদকে সম্পর্কিত করা হয়েছে)। কুরআনের নিকট বস্তুজগৎ শয়তানের রাজত্ব কিংবা দেহ পাপের আধার নয়। এমন কি ভবিষ্যত মানুষের ব্যাপকতর আশা–আকাঙ্ক্ষাও কুরআনে অঙ্কিত হয়েছে জাগতিকতার তুলিতেই। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম খ্রিষ্টানদের নিকট সামঞ্জস্যহীন, জগৎমুখী তথা ভোগবাদীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এর কারণ ইসলাম পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করার পলায়নবাদী প্রবণতা থেকে মুক্ত।

কুরআনের কতক আয়াত বুদ্ধিবৃত্তিক ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে এবং গবেষক মনের খোরাক যোগায় "আমরা পানি থেকে প্রতিটি জীবন্ত জিনিষ তৈরি করেছি।" (২১ ঃ ৩০) অথবা "একই পানি দিয়ে তাদেরকে (ফলবৃক্ষ) পরিচর্যা করা হলেও তাদের স্বাদ ভিন্ন। এখানে প্রজ্ঞাবানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (৫ ঃ ৪)

www.pathagar.com

শেষের আয়াতটি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্দীপনাদায়ক। এটা এমন এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় যা সকল রসায়নবিদ্যার প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে। ফলাফল এই যে, মুসলিমরাই রসায়নশাস্ত্রকে (আলকেমি) সবচেয়ে আপনার করে নিতে পেরেছে। স্বভাবতই এটি রহস্যবাদী দর্শন থেকে যৌক্তিক বিজ্ঞানময়তায়ই প্রত্যাবর্তনের নির্দেশক।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ওপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোর প্রায় প্রতিটিতে সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানত, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই প্রকৃতি ও বিশ্বের ওপর মানুষের আজকের এই আধিপত্য সম্ভব হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষমতার ভিত্তি মূলত অস্ত্র কিংবা অর্থনীতি নয়–সে বাহ্যিক মাত্র। তাদের ক্ষমতার ভিত্তি পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষাধর্মী চিন্তাপদ্ধতি যা তারা অর্জন করেছে বেকনের কাছ থেকে।[১০]

জাঁ ফরাসতি লিখছেন, "শিশুদেরকে প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ পর্যবেক্ষণ করার সুশিক্ষা দেওয়াটা পশ্চিমা জগতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা। ··· বাহ্য জগতের প্রতি আগ্রহ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের নিকট প্রাসঙ্গিক নয় ··· এটা ভাবা নিরর্থক যে, কোন মানবগোষ্ঠী গ্যালিলিও, পাসক্যাল, নিউটন, ক্লাউডি, বার্নার্ড প্রমুখের পরীক্ষামূলক চিন্তা–ভাবনা ব্যতিরেকেই প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পূর্বশর্ত হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন– বিমূর্ততা থেকে মূর্ততা, নিশ্চলতা থেকে গতির দিকে অগ্রসরতা।"[১১]

চেতনার আদিম স্তরে অবস্থান করে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। সালাত তখনই শুদ্ধভাবে আদায় করা সম্ভব যখন স্থান ও কাল সার্বিকভাবে ব্যবস্থিত হচ্ছে। সালাতের সময়সূচি জ্যোতির্বিদ্যক বাস্তবতা দ্বারা নির্ধারিত। বছরের বিভিন্ন সময়ে সালাতের পরিবর্তিত সময়সূচি কক্ষপথে পৃথিবীর কতক নির্দিষ্ট অবস্থানের অনুগামী। এদিকে যাকাতের জন্যে প্রয়োজন পরিসংখ্যান, প্রমাণ ও হিসাব। হজ্বযাত্রার সাথে ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ জড়িত। এক কথায়, মুসলিম সম্প্রদায় সব কিছু বাদ দিয়ে যদি শুধু এই কয়টি স্তম্ভের অনুশীলন করে তবু তারা সভ্যতার ন্যূনতম পর্যায় অতিক্রম করে যাবে।

বলে রাখা দরকার, ইসলামী বিজ্ঞানের বিতর্কিত ইতিহাস প্রমাণ করে, ইসলামের প্রথম শতকগুলোতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিকাশ তা ইসলামী অনুশাসনকে সর্বোচ্চ সম্ভব উপলব্ধির প্রচেষ্টার সাথে সংযুক্ত ছিল।

ব্যাপারটি পরিষ্কৃত হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে। গুস্তাবের History of Natural Science বইয়ে বিজ্ঞানের এই শাখায় ইসলামের প্রাণবন্ত অবদানের কথা অঙ্কিত হয়েছে। ইউফ্রেতিস উপত্যকায়, যেখানে তিন হাজার বছর ধরে স্বর্গীয় তথা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় জ্ঞানের সঞ্চয় হয়েছিল, ইসলাম উজ্জ্বল প্রভাবসহ আবির্ভূত হয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে অবদান রাখতে শুরু

www.pathagar.com

করে। কিন্তু যেহেতু দূরের নক্ষত্রের সাথে মানুষের ভাগ্যের সম্পর্কের ধারণাটি ইসলামে স্বীকৃত নয়, সেহেতু একেশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী ইসলামকে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে জ্যোতির্বিদ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। বাগদাদের জ্যোতির্বিদ্যক গোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে সেডিলট বলছেন, "জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে পৌঁছানো এবং যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সত্যায়নযোগ্য নয় তা না গ্রহণ করা– এরূপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রথম থেকেই এই গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক চারিত্র্য অর্জন করেছে।" আজকে আমরা যে গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি, খৈয়ামের ক্যালেন্ডার তার চেয়েও সঠিক। The Toledo Tables যার প্রণেতা সম্ভবত ইবরাহীম আয–যারকানী, যেখানে গ্রহের চলমানতার কথা বলা হয়েছে, তা অনেক দিন ধরে ইওরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল বিরুনী এই মত প্রণয়ন করেন যে, আকাশ নয়, পৃথিবীই তার অক্ষরেখায় ঘুরছে। ইবনে বাজ্জাহ দাবি করেন, গ্রহের কক্ষপথ সম্ভবত ডিম্বাকৃতি, গোলাকৃতির নয়।

জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এই যে আগ্রহ ও অংশ গ্রহণ, তা কুরআন অনুশীলনের প্রত্যক্ষ ফল। এবং ধর্মের এই যে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন তা বিজ্ঞান ও পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকিত আখ্যান।

ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সমন্বিত করার ইসলামী প্রবণতা মসজিদ ও স্কুলের একই সাথে নির্মাণ করার দৃষ্টান্ত থেকেও ধরা পড়ে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)–এর সময়েই মসজিদ ও বিদ্যালয় পাশাপাশি স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ খলিফা হারুন–অর–রশীদ (৭৪৬–৮০৮)–এর দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়। বিদ্যালয় ও মসজিদের বিচ্ছিন্নতা আসে অনেক পরে, নিযামিয়াহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু স্কুলগুলো দ্বৈততার নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে থাকে।

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মসজিদ শুধু প্রার্থনাকেন্দ্র হয়ে থাকেনি। রিসলার–এর মতে ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলোতে সৎ মানুষের যে কোন মিলনকেন্দ্রকে, হোক তা স্কুল, ক্লাব বা বাজার, মসজিদ বলে বিবেচনা করা হত।[১২]

এই প্রবণতা একমাত্র ইসলামী সাংস্কৃতিক বৃত্তেই লভ্য। এই যে মসজিদ–স্কুল, দ্বৈত কর্মকাণ্ডের এক অনন্য প্রকল্প, তা প্রকাশ করার যথার্থ প্রতিশব্দ ইওরোপীয় ভাষায় নেই। যৌগ উপায়ে গঠিত ফরাসি শব্দ "mosque-ecole"–এ এর সামান্য ছোঁয়া পাওয়া যায় মাত্র।[১৩]

বিখ্যাত বাগদাদ "নিযামিয়াহ" বহুদিন যাবৎ ইসলামী শিক্ষালয়ের প্রতিভূস্বরূপ ছিল। ইওরোপীয়দের নিকট এটা উচ্চতর ধর্মীয় স্কুল। প্রকৃতপক্ষে এখানকার পাঠ্যসূচিতে ধর্মতত্ত্ব, তফসীর, হাদিস, আখলাক, আকাঈদ প্রভৃতির পাশাপাশি আইন, দর্শন, গণিত, সাহিত্য,

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রকেও যুক্ত করা হয় অপরিহার্য বিষয়রূপে।[১৪] "নিযামিয়াহ্" পরবর্তীতে সকল ইসলামী নগরে উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে কাজ করে। এ কারণে ইসলামী জগতের শিক্ষা ব্যবস্থা ইওরোপীয় মাপকাঠিতে বিবেচ্য নয়-যেখানে তা ধর্মনিরপেক্ষ ও আধ্যাত্মিক-এই দুই ভিন্ন ধারায় পরিচালিত। ইসলামী শিক্ষালয়ের মধ্যে সবচে বড় ও সবচে পুরনো আল আযহার (৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) শুরুতে একাধারে মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই বিবেচিত ছিল এবং তা ধর্মতত্ত্ব শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় ইসলামের গভীর অবক্ষয়ের যুগে। ১৯৬১ সালের সংস্কার বলে চিকিৎসা ও প্রযুক্তি অনুষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল আয্হার তার মৌলিক চরিত্রে আবার অধিষ্ঠিত হয়েছে। একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই পাকিস্তানে রাষ্ট্র ইমামদের হাতে গণশিক্ষার পাঠ্যক্রম তুলে দিয়েছে। ইরানে শিক্ষিত সৈন্যরা জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার আলো জ্বালিয়ে তাদের সামরিক দায়িত্ব পালন করছে। সে ক্ষেত্রে মসজিদই স্কুল ঘরের কাজ করে।

"মসজিদ্-স্কুল" এমন একটি প্রতীকী চেতনকাঠামো যা থেকে কোন কিছু বাদ দেওয়া যাবে না কিংবা তাতে নতুন করে যুক্ত করারও কিছু নেই। কাজেই অপরাপর ধর্মের মত ইসলাম বাস্তবতাকে রহস্যময়তার পর্দা দ্বারা আবৃত করছে না। ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয় যখন কুরআনে আমরা আনন্দ-অনুভাবনা, যৌনানুভূতি, সংগ্রাম, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত দেখি। ধর্মের খাতিরে উন্নততর জীবন পরিত্যাগ করা কিংবা বিজ্ঞানের খাতিরে ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা-এই প্রক্রিয়া অন্তত ইসলামের নয়।

ইসলাম কখনো স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম আমাদেরকে ফেরেশতা বানাতে চায় না, কারণ তা সম্ভব নয়, বরং ইসলাম সম্ভবপর মানবিকতার ফ্রেমে আমাদেরকে বাঁধতে চায় অত্যন্ত মসৃণভাবে। কিন্তু স্বর্তব্য, প্রকৃতি, সমৃদ্ধি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ক্ষমতা, জ্ঞান, আনন্দ অনুভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা নিঃসন্দেহে পশ্চিমা সভ্যতার সমরূপ নয়।

ইসলাম চায় মানুষ সকল দায়-দায়িত্বের মুখোমুখি হোক; সারা জীবন অত্যাচারিত, দারিদ্র্যপীড়িত ও ধ্যানী হয়ে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়।[১৫] মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প বাস্তবায়নই ইসলাম।[১৬] ক্ষমতা ও স্বস্তির জন্যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এবং নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জন-এই দ্বিস্রোতধারার সম্মিলনেই ইসলামের প্রাণ জেগে ওঠে।

গোসপেল মানুষের সহজাত প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু আত্মার কথা বলেছে। কুরআন এগুলো আবার ফিরিয়ে এনেছে। ফ্রয়েড প্রমাণ করেন যে, যৌনপ্রবণতা ধ্বংসযোগ্য নয়, শুধু এর অবদমন করা যেতে পারে। কিন্তু যৌনতার ক্ষেত্রে অবদমনের অর্থ হল মানসিক ও অন্যান্য বিকৃতি। কাজেই খ্রিষ্টানদের পূর্ণাঙ্গ যৌন কৃচ্ছ্র সাধনে আপাতদৃষ্টিতে যতই মহত্ত্ব থাক

www.pathagar.com

না কেন, ইসলামের পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণই মানব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম মূলত কোন ধর্ম নয়।

কুরআনের বক্তব্য যতটা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে, তার চেয়ে বেশি জনগণকে। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষ তার সামাজিক প্রবণতা ও কর্মকাণ্ড অপরাপর মানুষের সাথে পরিচালনা করে থাকে, আবার ব্যক্তিত্ব হিসেবে সে স্বর্গেরই ইমিগ্রান্ট যে প্রেক্ষাপটে তার কাছ থেকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও গুণাবলী দাবি করা হয়–মানুষের এই দুই প্রেক্ষিত যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তার আদর্শের সাথে প্রাকৃতিক, দৈহিক, সামাজিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে ইসলামকেই কেন্দ্রালোকে পাচ্ছি আমরা।

মানুষ যদি একাধারে স্বর্গীয় ও সামাজিক জীব হিসেবে তৎপ্রসূত প্রবণতাকে সমন্বিত ও লালন না করতে পারে তবে ভারসাম্যহীনতা অনিবার্য।[১৭] পশ্চিমা মানুষের মনোবৈকল্য ও বিভিন্ন বিকৃতি অংশত এই ভারসাম্যহীনতার ফল। ব্যক্তিজীবনে খ্রিস্টান ও বাহ্য জীবনে ম্যাকিয়াভিলেন– এই নীতির পরিচর্যা কখনো মসৃণতর সমাধান আনতে পারে না।

মুহাম্মদ (সাঃ) বলছেন, "আমি দুই জনের ব্যাপারে অসন্তুষ্টঃ অজ্ঞ ভক্ত এবং নাস্তিক পণ্ডিত।"[১৮] সন্দেহ নেই যে, ক্ষমতাহীন বিশ্বাসী, বিশ্বাসহীন শাসক, নোংরা শরীরে বিশুদ্ধ আত্মা, ক্ষমতাহীন ন্যায় ভাবনা, অপব্যবহৃত ক্ষমতা প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁর একই অভিব্যক্তি ছিল। সুন্দরতর জীবনের জন্যে নিপীড়ন, অজ্ঞতা, অসুস্থতা, দুঃখ–বেদনা, নোংরামির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তিনি সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছেন এবং একই সাথে নৈতিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা কামনা করেছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন।

কাজেই ইসলামকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক তথা বাহ্যিক ও আন্তরিক জীবনের দাবিপূরকরূপে। কুরআন মানুষকে বলছে অন্তর্মুখী জীবন যাপনের কথা "ইহজগতে তার অধিকারকে স্মরণে রেখে"।[১৯] এই সংজ্ঞার্থ বিবেচনায় আমরা বলতে পারি যে, সব মানুষই প্রচ্ছন্নভাবে মুসলিম।[২০] প্রত্যেক শিশু মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা–মাতা ও পারিপার্শ্বিকতা তাকে ভিন্নমতাবলম্বী করে তোলে–এ ধারণা এ প্রেক্ষাপটে বোঝা যেতে পারে। ইসলাম মানুষের জন্যে সর্বাধিক প্রযোজ্য ব্যবস্থা, কারণ তা মানবচরিত্রের দ্বৈত প্রকৃতিকেই স্বীকৃতি দেয়।[২১] অন্য যে কোন বিকল্প শুধু মানুষের খণ্ডিত প্রেক্ষিতকে ধারণ করে, ফলত সেখানে সরল ও স্বাভাবিক মানবিক আকৃতিকে স্বাগতম করা সম্ভব হয় না এবং সে কারণেই বলা হচ্ছে, man is the most obvious argument of Islam.

www.pathagar.com

দ্বৈততা কোন দুরূহ তত্ত্বদর্শন নয়, এটা জীবনেরই চূড়ান্ত রূপ। যেমন, কবিতা হৃদয়সর্বস্ব শিল্প, কিন্তু মহত্তম কবিগণ–হোমার, ফেরদৌসী, দান্তে, সেক্সপিয়ার, গ্যেটে– তাঁদের কবিতাকে যুক্তি ও অনুভূতি, বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছেন। কবিতা ব্যক্তিসৃষ্ট, সমাজের সৃষ্ট নয়; কিন্তু ব্যক্তি হোমারের কবিতা গ্রীক জাতি গঠনে সাহায্য করেছিল এবং হুইটারের অগ্নিগর্ভ কবিতা সাহায্য করেছিল আমেরিকার দাস প্রথা নির্মূলকরণে। অংক বুদ্ধির অধিগত, "কিন্তু একজন ভাল অংকশাস্ত্রবিদ একজন ভাল কবিও বটেন", বলেছেন Weierstrass. সকল উঁচু মাপের পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী একদিক থেকে রহস্যবাদী ছিলেন ঃ কোপারনিকাস, নিউটন, কেপলার, আইনষ্টাইন, অপেনহেইমার প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শাস্তি একটি অবদমনমূলক ব্যবস্থা হলেও শাস্তি যথার্থ হলে অপরাধী ও অন্যদের জন্যে একটি শিক্ষামূল্য থেকে যায়। এদিকে স্রষ্টার প্রতি ভয় থেকে যেমন নৈতিকতার শুরু, তেমনি স্রষ্টার প্রতি ভয় থেকে তার প্রতি ভালবাসারও শুরু। খেলা যদিও দৈহিক তৎপরতা মাত্র, এর একটি শক্তিশালী ও শিক্ষণীয় দিকও আছে। প্লেটো 'প্লেটো' নামটি পেয়েছেন তাঁর চওড়া কাঁধের জন্যে। শক্তিশালী দেহ উন্নত আত্মার সেবক। দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও দেহ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, পদার্থিক চিন্তা ও ভাববাদী দর্শন সুসমন্বিত হলেই জীবনের মৌলচিত্র উদ্ভাসিত হয়। নগ্ন বুদ্ধিমত্তা ও খাঁটি ভাবগ্রাহ নিশ্চিতভাবে অবক্ষয়ের পরিচায়ক।

তথাকথিত সহজাত শিক্ষার (natural education) উদ্দেশ্য কি? রুশো এর একটি উত্তর দিয়েছেন এইভাবে, "যা কিছুর পরস্পরিক সমঝোতা কষ্টকর বলে বিবেচিত, অথচ মহৎ মনীষিগণ যে সমঝোতা সম্ভব করে তুলেছেন, তারই চর্চা করা সহজাত শিক্ষার উদ্দেশ্য, যেমন ঃ দৈহিক ও মানসিক শক্তি, দার্শনিকের বোধি ও ক্রীড়াবিদের নৈপুণ্য।"

নীতিগতভাবে নৈতিকতার সাথে বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া সুবিচার সাধন সম্ভব নয়। সুবিচার হল ন্যায়ভিত্তিক সমতা ও ক্ষমতার ধারণার মধ্যকার ঐক্য বিধান। বহুল পরিচিত যে রাজনৈতিক সাম্য–স্বাধীনতা–ভ্রাতৃত্বের ধারণা তা এসেছে ধর্ম থেকে, কিন্তু স্বীয় মহৎ আদর্শগুলো জোর–জুলুমপূর্বক বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ধর্মের অক্ষমতা রয়েছে বলে তার আবেদনগুলো পৌঁছানো হয় অত্যাচারিত মানুষের নিকট বিনীতভাবে। ধর্মের এই অক্ষমতার সুযোগে রাজনীতি ও সন্ত্রাস ধর্মাগত আদর্শকে তাদের নামেই চালিয়ে দিতে পেরেছে।

প্রয়োজনীয়তা ও নৈতিকতা তথা বিজ্ঞান ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনায় নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহে নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গটি আনতে পারি। এটি

www.pathagar.com

সকল কালের একটি সার্বজনীন ধারণা। এখানে জীবন স্বয়ং যেন ইসলামী পথটিই অনুসরণ করছে।

নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহে যে নিষেধাজ্ঞা, তা খাঁটি নীতিবোধ থেকে এসেছে নাকি তা বায়োলজিক্যাল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত? সরলভাবে এর উত্তর দেয়া যাবে না। বায়োলজিক্যাল কারণটি সন্দেহের অতীত। বিখ্যাত রুশ জীববিজ্ঞানী তিমিরিয়াজেভ লিখছেন, "পিতা-মাতার মধ্যকার নিকট সম্পর্ক যে সন্তানের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে, এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা শুধু মানুষেই প্রযোজ্য নয়, বরং পশু ও গাছপালাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য।"[২২]

আবার অনাচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাটি একটি অতি পুরনো নৈতিক কোড হিসেবে চলে আসছে। অতীতের মত আজকের যুগেও অনাচার ও নিকটাত্মীয়ে বিবাহকে নৈতিক স্খলন মনে করা হয়, ফলত তা নিষিদ্ধ। সে ক্ষেত্রে এটা নীতি ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সামঞ্জস্য ও সম্পর্কের একটি দারুণ দৃষ্টান্ত বৈকি! এবং এখানে আমরা ইসলামকেই পাচ্ছি আবার।

এদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা কিছু অবদান রেখেছে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যকার চরিত্রগত দ্বৈধতা উপলব্ধি করা যায়। চিকিৎসা ব্যাপারটি কখনোই একটি খাঁটি বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। এটা একই সময়ে বিজ্ঞতা, নীতি ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলরাও ব্যাপার। সম্প্রতি এমন অসুস্থতার সন্ধান পাওয়া গেছে যার কোন অঙ্গগত ব্যাখ্যা নেই। রোগীর সমস্যাটি তার মনোজগৎ থেকে উৎসারিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিককালীন শাখা সাইকোকসমিক, যা শরীর ও মনের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে, এর মতে আলসার, হাঁপানী, ডায়াবেটিস-এগুলোর উৎপত্তি প্রাথমিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক জগৎ তথা মনোগত দ্বন্দ্ব বা পীড়ন থেকে।

এ কারণে সত্যিকার চিকিৎসা শুধু দৈহিক-রাসায়নিক থেরাপি বা অস্ত্রোপচার বা অন্য কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা সর্বাংশে সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবে "কোন অসুস্থতা নেই, আছে অসুস্থ মানুষ"। সত্যিকার চিকিৎসা রোগ বিষয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন রোগী বা রোগীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কারণ একই রোগের উপসর্গ সব সময় একই হয় না বা একই রোগের দুজন রোগীর জন্যে চিকিৎসা বিধান একই রকম নাও হতে পারে। এ কারণে রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা, উৎসর্গ, উপোস এবং বিভিন্ন আচার-নিষ্ঠার যে পুরাকাহিনী আমরা জানি তার মধ্যে বাস্তবতা নিহিত আছে বলে স্বীকার করতেই হয়। এ প্রবণতা আজকের যুগেও ধরে রাখা হয়েছে। প্যারিসের হাসপাতালে মিউসিকোথেরাপি প্রয়োগ করা হয় বহুবিধ রোগের ক্ষেত্রে।[২৩] মানুষকে প্রভাবিত করে এমন অনেক কিছুর মত চিকিৎসাকেও বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার অন্তর্যোগের ফলাফল হিসেবে ধরতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

এভাবে বিবেচনা করলে আমরা দ্বৈততার আরও দৃষ্টান্ত দেখি। যেমন শিল্প ও কারুশিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও তা কখনোই সম্পূর্ণ হয়নি। একটি মানবিক কর্ম কখনোই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হতে পারে না যেমনটি হতে পারে না সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিশীল। এমন কোন কারুকর্ম নেই যা সৃষ্টিশীলতা নির্দেশ করে না, আবার এমন কোন শিল্পকর্ম নেই যা টেকনিক নির্দেশ করে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখছি ঃ আছেন শিল্পী, আছেন শিল্পের ক্রেতা; আছেন লেখক, আছেন প্রকাশক; আছেন স্থপতি, আছেন পুঁজি বিনিয়োগকারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

সঙ্গীতের ইতিহাসও টেকনিক ও ধারণার মধ্যকার আন্তঃনির্ভরতা প্রমাণ করে। বেতোফেন, বার্ক, মোৎসার্ট–এরা ভাবসমন্বয়ের পাশাপাশি সাংগীতিক টেকনিক এবং অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থাপনা নিয়েও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন।

জীবন সব সময় দুটো স্বাধীন বাস্তব সত্তার মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফল। অন্য কথায় মানুষের জীবতাত্ত্বিক ও বস্তুগত ভিত্তির সম্মিলিত প্রভাব এবং চৈতন্যবাহী মানবিক সৃষ্টিশীলতা, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, প্রতিনিধিত্বশীল ধারণা ও আদর্শ ইত্যাদির সম্মিলনে গড়ে উঠেছে ইতিহাস। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতিটি মুহূর্ত এই দুটো অত্যাবশ্যকীয় স্বতন্ত্র গতিশক্তিরই ফল।

ইতিহাসের গতিধারা নির্মাণে মানুষের যে প্রভাব তা নির্ভর করে তার ইচ্ছাশক্তি ও চৈতন্যের স্তরের ওপর। ইতিহাস নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য যত বেশী, বাহ্যিক চিন্তার বেষ্টনী থেকে তারা তত বেশি মুক্ত। মূলত মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। বাহ্য নিয়মের কোন আধিপত্য তার ওপর নেই। তার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সে তার দুর্বলতা ও বিপদাপদকে প্রতিরোধ করেছে। একজন সাধারণ মানুষকে সিংহপালের মধ্যে নিক্ষেপ করলে তার ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু সে কথা একজন সিংহপালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতি ও ইতিহাসের ওপরে আমাদের যে আধিপত্য তা নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে আমাদের নিজেদের ওপর আমাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর। এটাই ইতিহাসের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আদর্শের সৃষ্টিশীল প্রভাব এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে এই বাস্তবতার পরিবর্তন–পরিবর্ধন বিষয়ে ব্যাখ্যা দান করে। পাশাপাশি তা নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত কার্যকারণ বা বাহ্য ঘটনাবলীকেও সমানভাবে ব্যাখ্যা করে। কাজেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদ বা বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন শূন্য ভাববাদ–উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে। ঘটনা ও ধারণা, বাস্তবতা ও মানুষ তাদের সঠিক মূল্য অর্জন করে এই ইসলামী কাঠামোতেই।

www.pathagar.com

টীকা

১. এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎ হলেন Apostle Jacob. তাছাড়া মধ্যযুগের প্রারম্ভে "খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা গর্ব করতেন এই বলে যে, তাদের পা নদী পার হওয়া ছাড়া অন্য কোন সময়ে পানির স্পর্শ পায়নি।"—Russell, The History of Western Philosophy, London, 1946, P. 396.

২. Risler, La Civilization Arabe, P. 35.

৩. The Qur'an ২ : ২২২।

৪. এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাবের সাথে সাথে রোমান সভ্যতায় নির্মিত গণস্নানাগারগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপরীতক্রমে পৃথিবীতে এমন কোন মসজিদ নেই যার নিকট ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পানির উৎস নেই।

৫. তুলনামূলক বিচেনার জন্যে আমরা এখানে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৭৬) মিল্টন ফ্রিডম্যান প্রস্তাবিত "negative taxation"-এর প্রসঙ্গ টানতে পারি। এই ধারণা অনুযায়ী সরকারের অর্থ বিভাগ অপর্যাপ্ত উপার্জনকারীদেরকে এই "negative tax" প্রদান করবে। ফ্রিডম্যান বলছেন, "আমেরিকার দারিদ্র্য অনেক আগেই দূরীভূত হত যদি সামাজিক অর্থ ভাণ্ডারগুলো খরচবহুল সমাজকল্যাণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত না হয়ে সাত্যিকারের অভাবীদের সাথে সম্পর্কিত থাকত।"- ফ্রিডম্যানের এই "negative tax" যাকাতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬. কুরআন বলছে, "যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, সালাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে তাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় কিংবা অনুতাপ করতে হবে না।" (২ : ২২৭)

৭. মুহাম্মদ (সাঃ) একবার বলেছিলেন, "অকল্যাণকর কিছু দেখলে হাত দিয়ে তা অপসারণ কর, সেটা সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ কর ; সেটাও সম্ভব না হলে অন্তত অন্তরে তা ঘৃণা কর-কিন্তু শেষেরটি দুর্বলতম ঈমান।"

৮. স্থাপত্য বা Architecture-এর নাম থেকেও এর দ্বৈততা প্রতিফলিত হয়। Archi + tecture-এর অর্থ tecture-এর চেয়েও বেশি কিছু। রেনেসাঁ যুগের প্রায় সকল স্থাপত্যবিদ শিল্পীও ছিলেন (চিত্রকর/ভাস্কর) ; অপরদিকে শ্রেষ্ঠতম ইংরেজ আর্কিটেক্ট Christopher Wren প্রথমত একজন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।

৯. The Qur'an 96 :1.

১০. এবং বেকন মুসলিমদের কাছ থেকে। দ্রষ্টব্য এই বইয়ের একাদশ অধ্যায়।

১১. Jean Fourastie : The Civilization of Tomorrow, Zagreb, PP. 47—48.

১২. Stephas Bianco, in the magazine "Werk" Switzerland, September 1976; Risler, La Civilization Arabe, P. 128.

www.pathagar.com

১৩. এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে যে, স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক নির্মিত ইসলামের প্রথম মসজিদ (মসজিদ-উন-নবী) একই সাথে একটি স্কুলও ছিল-একে বলা হত "সাফাহ" (Saffah).

১৪. See Risler, ibid.

১৫. "ইসলামে সন্ন্যাসতন্ত্র নেই।"- হাদিস

১৬. "হে ঈমানদারগণ, সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা থেকে দূরে থেকো না, কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না ; কারণ আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।" (৫ ঃ ৯)

১৭. Karen Horney, Les voies nouvelles de la Psychoanalyse, Paris, 1951.

১৮. Ralph Waldo Emerson কর্তৃক লিখিত Conduct of Life বইয়ে উদ্ধৃত।

১৯. The Qur'an 28 : 77.

২০. "তাই যদি ইসলাম হয়, তাহলে সকলেই আমরা ইসলামের মধ্যে জীবন যাপন করছি", বলেছেন গ্যেটে।

২১. The Qur'an 30 : 30.

২২. Timiriazev, Life of Plants, P. 134.

২৩. Committee for Musico-Theraphy" (প্যারিস)-এর চেয়ারম্যান হলেন বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোশিল্পী Yehudi Menuhin.

www.pathagar.com

আইনের ইসলামী প্রকৃতি

শাস্তি ও সামাজিক প্রতিরোধ

অপরাধীর শাস্তি হওয়া যথার্থ কিনা–এটি একটি ধ্রুপদী প্রশ্ন। এ পর্যায়ে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হয়েছে। একদল বলছেন, অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা যথার্থ কারণ প্রত্যেক মানুষেরই ভাল–মন্দ নির্বাচনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা রয়েছে; অন্য দলের মতে শাস্তি দেওয়া অর্থহীন কারণ অপরাধকর্ম পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সেক্ষেত্রে শাস্তির কোন স্থান নেই, প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধের (defence sociale)। শাস্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের এই বিতর্ক অপরাধ আইনের মতই পুরনো। আইনের সবচে পুরনো সংকলন 'হামবুরাবি কোড'–এ আমরা শাস্তির ধারণা পাচ্ছি। অপরদিকে Van Der Made দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে সামাজিক প্রতিরোধের ধারণার অস্তিত্ব ছিল।[১]

ব্যক্তিবাদীরা বিশ্বাস করেন, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। দৃষ্টবাদীদের চিন্তায় মানুষ নয়, মানুষের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাই দায়ী। প্রথম পক্ষের মতানুযায়ী মানুষ হল সক্রিয় কর্তা, ইচ্ছাস্বাধীন, দায়িত্ববহ; দ্বিতীয় পক্ষের মতে, মানুষ বায়োলজিক্যাল প্রেক্ষিতে প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ অন্যান্য বস্তুর মধ্যে একটি বস্তু মাত্র। সেক্ষেত্রে তার ইচ্ছা – স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি অবান্তর অর্থাৎ একদিকে বলা হচ্ছে, ভাল ও মন্দ হওয়াটা মানুষ নিজেই নির্ধারণ করতে পারে, আরেক দিকে বলা হচ্ছে মানুষ ভালও নয় মন্দও নয়, যেহেতু পারিপার্শ্বিকতা তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই তার ইচ্ছা– স্বাধীনতা ও দায়িত্বও থাকতে পারে না।–এখন এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এই দুই চিন্তাধারার একটি অপরটি থেকে 'সহিষ্ণুতর' বা 'কঠোরতর' –তা নির্ভর করে অন্যান্য অনেক পরিস্থিতির ওপর।

মৃত্যুদণ্ডের মত স্পর্শকাতর প্রশ্নে দুই মতগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।[২] উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা সুবিচার–অবিচার দুটোই হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিবাদীদের মতে এটা হবে একজন স্বাধীন মানুষের দ্বারা কৃত বড় ধরনের অপরাধের যথার্থ প্রতিদান; সামাজিক প্রতিরোধের প্রবক্তাদের নিকট এই মৃত্যুদণ্ডের অর্থ সমাজদেহের একটি ত্রুটির অপসারণ। প্রথম ক্ষেত্রে আসছে মানবিক ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসছে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। এই দুই ব্যাখ্যায় দুই দর্শনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় যার একটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আদি সৃষ্টিক্রিয়া, অপরটি স্মরণ করিয়ে দেয় ডারউইন ও বিবর্তনবাদকে। অন্য কথায় ব্যক্তিবাদীরা আক্ষরিক অর্থেই উপযুক্ত শাস্তির ধারণাকে লালন করেন। কিন্তু বস্তুবাদীরা কঠিন পদক্ষেপ নেবেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই শাস্তি হিসেবে নয়। এই পদক্ষেপের অর্থ, এ্যাঙ্কেলের ভাষায়, দুষ্কৃতকারীকে নিরপেক্ষীকরণ বা neutralize করা–প্রতিশব্দটি পদার্থবিদ্যার এবং এই neutralization

www.pathagar.com

সম্ভব হতে পারে অপরাধীকে 'পৃথিবী থেকে সরিয়ে' দিয়ে কিংবা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা কিংবা পুনঃশিক্ষার (re-education) মাধ্যমে।[৩]

সাধারণভাবে বলতে গেলে শাস্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির লক্ষ্য সুবিচার, দ্বিতীয়টির লক্ষ্য স্বার্থ; প্রথমটির দৃষ্টি ব্যক্তির দিকে, দ্বিতীয়টির দৃষ্টি সমাজের দিকে; প্রথমটিতে শাস্তি নির্ধারিত হয় অপরাধের প্রকৃতি বিচার করে, দ্বিতীয়টিতে শাস্তি নির্ধারিত হয় সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধটি কতটা ক্ষতিকর–সে বিবেচনা সামনে রেখে।

কাজেই সামাজিক প্রতিরোধের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন নিরপরাধ মানুষকে তার অধিকার খর্ব করা দূষণীয় নয়। এ প্রেক্ষিতে 'সামাজিক প্রতিরোধ' সাধারণ গণ বিশোধন ও প্রতিরক্ষার নামে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল স্ট্যালিনের 'বিশোধন' প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অন্তত দশ মিলিয়ন মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাপারটি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন শাস্তি নয়, বরং সমাজকে অবাঞ্ছিত ঝামেলা থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া। অপরদিকে শাস্তি হল নৈতিক ধারণা যা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে এসেছে 'স্রষ্টার শাস্তি' হিসেবে; বিষয়টি ধর্ম ও শাস্তির মধ্যকার পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে প্রমাণিত করে। এক কথায় একটি হচ্ছে দৃষ্টবাদিতা, অপরটি সারধর্মী ভাববাদ।

শাস্তি সম্পন্ন হয় আইনানুগ পদ্ধতির অনুসরণে এবং সামাজিক প্রতিরোধ চলে বিশেষ আচরণ দ্বারা। শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আদালতের ট্রায়াল একটি নাটক কিংবা ধর্মানুষ্ঠানের মত[৪] যেখানে স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও ন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত। বিপরীতক্রমে সামাজিক প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় জড়িত রয়েছে চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজ বিজ্ঞানী কিংবা প্রশাসন; এখানে কোন বিচারক নেই। ব্যাপারটি আমাদেরকে ইউটোপিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে আদালত নেই, ট্রায়াল নেই–কারণ সেখানে স্বাধীনতা নেই, দায়িত্ববোধও নেই।

কাজেই শাস্তির প্রসঙ্গটি আসছে স্বাধীনতাসম্পন্ন মানুষকে ঘিরে, কিন্তু সামাজিক প্রতিরোধ প্রক্রিয়াটি সমাজের একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে, যেখানে উক্ত সদস্য সামাজিক স্বার্থের প্রতি হুমকিস্বরূপ কিংবা অনুকূল হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই 'দোষী' বা 'দায়ী' নয়। এখানে ভালমন্দ নির্বাচনের প্রশ্ন আসছে না, প্রশ্ন বাস্তবতার এবং এই বাস্তবতার সাথে বোধের কোন সম্পর্ক নেই। মানবতা করুণা নয়। এপিকটেটাস বলছেন, "তুমি অন্ধ ও পঙ্গুকে করুণা করছ, দুষ্কৃতকারীকেও কেন করুণা করছ না?" কিন্তু দুষ্কৃতকারীকে করুণা করা করুণারই উদাহরণ, মানবতার নয়। মানবতা হল মানুষকে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল হিসেবে স্বীকার করা এবং তার প্রতি সকল আচরণ সেই সূত্রে গ্রথিত করা। মানুষকে

www.pathagar.com

দায়দায়িত্বহীন বিবেচনা করার মাধ্যমেই মানুষকে সবচে' নীচু স্তরে নামিয়ে আনা হয়। মানুষই নীতিগতভাবে দায়ভারাক্রান্ত, পশু কিংবা বস্তু নয়। এখানেই স্টোয়িসিজম (Stoicism) ও ধর্মের মধ্যকার পার্থক্য। প্রথমটির অবলম্বন করুণা ও ক্ষমা, দ্বিতীয়টির অবলম্বন দায়িত্ববোধ,[৫] অতঃপর করুণা ও ক্ষমার পথ। মানুষকে মুক্ত করলেও সামাজিক প্রতিরোধ মূলত অমানবিক। বিপরীতক্রমে মানুষকে কঠিন দণ্ড প্রদান করলেও শাস্তি একটি মানবিক প্রক্রিয়া। শাস্তি অপরাধীর মানবিক অধিকার, তার ব্যত্যয়ের অর্থ হল তাকে তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। হেগেল পূর্বাপর বলে এসেছেন, উপযুক্ত শাস্তিই অপরাধীর মানবিক মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; পুনঃশিক্ষা, পরিশোধন কিংবা অন্য কোন প্রক্রিয়া নয়।

দায়িত্ববোধের একটি অন্যতর অভিজ্ঞানও রয়েছে। পৃথিবীতে একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের যে দায়িত্ববোধ তা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, একজন শাশ্বত স্রষ্টা অস্তিত্বশীল। কার্যত পৃথিবীর সমস্ত আইন-কানুন সৃষ্টিকর্তার নিখুঁত ন্যায়বিচারেরই ম্লান অনুকরণ। অপরাধ স্রষ্টার ক্রোধকে উদ্রেক করে-এই বিশ্বাসের মধ্যেও উপযুক্ত শাস্তির ধারণার উৎস পাওয়া যায়।

এই যে দায়িত্ববোধ, বিচার ও শাস্তির কথা বলা হচ্ছে তার কোন স্থান বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনায় নেই। শাস্তির উদ্দেশ্য নৈতিকতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যা সংশ্লিষ্ট অপরাধীর অপরাধকর্ম দ্বারা বিঘ্নিত হয়। হেগেলের ভাষায় শাস্তি এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা (a remedium pecatti)। সংজ্ঞাটি নিষ্প্রাণ মনে হলেও তা তার মৌলিক অর্থ ও গুরুত্বকে ধরে রাখবে চিরকাল।

আমাদের আলোচনার শেষপাদে পৌঁছেছি আমরা। এতক্ষণ উপরোক্ত বিবেচনা মূল প্রশ্নের তত্ত্বীয় দিক তুলে ধরেছে মাত্র এবং তা, এই বইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, দুটো অনিবার্য প্রস্তাবনা দাঁড় করায়ঃ প্রথমত, অপরাধের জন্যে শাস্তির তত্ত্বকে তার বিরোধী ও সমমূল্যবান সামাজিক প্রতিরোধ তত্ত্বের সাথে একনিষ্ঠ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, দার্শনিক ও তত্ত্বীয় ভিত্তি যা-ই থাক না কেন, যে কোন আইনই বাস্তবায়নের অর্থ হল তত্ত্ব থেকে দূরে সরে আসা। সুতরাং বাস্তবে শুধু অপরাধের নীতির ওপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধি রচিত হতে পারে না। একইভাবে শুধু সামাজিক প্রতিরোধের নীতির ওপর ভিত্তি করেও কোন দণ্ডবিধান সম্ভব নয়। আমরা শুধু এই দুই নীতির পারস্পরিক অল্প প্রভাব বা অধিক প্রভাব নিয়ে কথা বলতে পারি।

উনবিংশ শতকে যে উগ্র সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরু, অনিবার্যভাবেই তার পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়েছে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা মার্ক এ্যাঙ্কেল লিখছেন, "দুই বিধানের (শাস্তির ক্লাসিক্যাল মতবাদ ও সামাজিক প্রতিরোধ মতবাদ) সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত একটি মধ্যম পথ (media via) নিঃসৃত হয়ে পড়ে।· · · সামাজিক প্রতিরোধের সক্রিয়

www.pathagar.com

সমর্থকরা ভাবছেন যে, অপরাধ আইন ও সামাজিক প্রতিরোধ ভাবনাকে একটি নবতর প্লাটফর্মে একত্র করতে হবে।"[৬] ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত L' Union Internationale de Droit Penal নামক সংস্থাটি প্রথমদিকে সামাজিক প্রতিরোধের পক্ষে তীব্রভাবে ওকালতি করলেও পরবর্তীতে আলোচ্য দুই মতবিধানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। ১৯১৪ সালে এই সংঘ ঘোষণা করে, "তারা এখন দুই মতবিধানেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।"

এভাবে দেখা যাচ্ছে, শাস্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের দুই 'মেরুবিপরীত' নীতি পরস্পর সমন্বিত হয়ে একটি তৃতীয় বিকল্পের (biopolar unity) বিজয়কে সুনিশ্চিত করছে।

ইসলাম একটি বিশুদ্ধ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে উপযুক্ত শাস্তির নীতিকে; সেই সাথে 'ইসলামীকৃত ধর্ম' হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছে সামাজিক প্রতিরোধের কতক ধারণাকেও। মার্ক এ্যাঞ্চেল লিখছেন, "চতুর্দশ শতকের[৭] ইসলামী আইন সাত বছরের অনূর্ধ্ব শিশুর দায়-দায়িত্বহীনতা মেনে নিয়েছে এবং সাত বছর বয়স থেকে যৌবনে পদার্পণকারী অপরাধীদেরকে সংশোধনী শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। এ পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া কুরআনে উল্লিখিত পাঁচটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীর চরিত্র ও অপরাধ সংগঠনের পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনাসহ স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন।"[৮]

টীকা

১. Van Der Made : "Contribution a l'Etude de Historie de la defense sociale", Revue de Crimonologic etde Droit Penal, 1949-50, P. 944.

২. উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় সুইস আইনবিদ M Grave সুইজারল্যান্ডে মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহালের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন।

৩. ভাববাদী কান্ট ও হেগেল যখন আক্ষরিক অর্থেই tooth for tooth-এর কথা বলছেন, তখন বস্তুবাদী হলবাক অপরাধ আইনে যথার্থ শাস্তিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছেন, Holback: System de la Nature.

৪. E. Bloch দেখিয়েছেন যে, নাটকের উৎপত্তির দুই উৎসঃ Court ও mystery.

৫. The Qur'an 23:116 ও অন্যান্য স্থানে।

৬. Ancle : La defence sociale nouvelle, Paris, 1954.

৭. চতুর্দশ শতক নয়, ইসলামের শুরু থেকেই এই ব্যবস্থা অস্তিত্বশীল।

৮. এ সমস্ত ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ Said Mustapha El-Said Bey : "La notion de responsabilite Penal", Travaux de la Semaine international de droit musulman, Paris, 1951, ও L. Milliot : Introduction a l'Etude de droit musulman, Paris, 1953.

www.pathagar.com

ধারণা ও বাস্তবতা

বিবাহ

বিবাহ প্রথা মানব জাতির সমান বয়সী এবং ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি ভাল দৃষ্টান্ত। বিশুদ্ধ ধর্ম দাবি করে কৌমার্য, বস্তুবাদ দাবি করে অবাধ যৌন স্বাধীনতা। কিন্তু উভয় পক্ষই স্বীয় ধারণা বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নানা সমস্যার কারণে অনিবার্যভাবে একটি মধ্যম সমাধান হিসেবে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হয়।

আদি খ্রিষ্টবাদে বিবাহের কোন স্থান নেই। যীশু খ্রিষ্ট কৌমার্যের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। "ব্যভিচার না করার জন্যে বলা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন নারীর দিকে কামদৃষ্টিতে তাকায় তৎক্ষণাৎ উক্ত নারীর সাথে তার ব্যভিচার সম্পন্ন হয়ে যায়, তার হৃদয়ে।"[১] অর্থাৎ খ্রিষ্ট শিক্ষা মতে মানুষকে যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। টলস্টয় বলছেন, "যারা বিশ্বাস করে যে বিবাহের মাধ্যমে অবাধ যৌনতা সংবরণ করে ধীরে ধীরে উচ্চতর বিশুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, তারা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।" সেন্ট পল তাঁর একটি চিঠিতে বলছেন, "অবিবাহিত মানুষ খোদা এবং কিভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়–সেই চিন্তায় মগ্ন। বিবাহিত মানুষ বিভোর কিভাবে এই পৃথিবী ও তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা যায়–এই ভাবনায়।"[২]

কিন্তু বিবাহকে অশুভ ও বিশুদ্ধতা হ্রাসের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করার খ্রিষ্টীয় নীতি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এসেছে। "একজন নারীকে স্পর্শ না করা একজন পুরুষের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু লাম্পট্য নিবারণের জন্যে একজন পুরুষের জন্যে একজন নারী থাকা বাঞ্ছনীয়।"[৩]

এটা এক ধরনের আপোষ। বিবাহ তাই খ্রিষ্টীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন সমাধান নয়, বরং চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা ঃ 'বেশ্যাবৃত্তি ও লাম্পট্য পরিহার করার বিকল্প' হিসেবে।

এদিকে বস্তুবাদ বিবাহকে বাতিল করতে চায় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। বস্তুবাদীদের মতে "ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিবাহের অর্থ একজনের ওপর আরেকজনের যৌন আধিপত্য।" এবং "প্রথম শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে নারী–পুরুষের মধ্যকার ব্যক্তি পর্যায়ের বিবাহজনিত দ্বন্দ্ব থেকে।– উৎপাদন পদ্ধতিকে সাধারণ মালিকানায় স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসেবে পরিবারের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। ঘর গৃহস্থালি রূপান্তরিত হয় সামাজিক কারখানায়। শিশুদের যত্ন ও শিক্ষা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, সমাজ প্রত্যেক শিশুকে সমান চোখে দেখে থাকে। এটা একটি মেয়েকে তার পছন্দের পুরুষে নিবেদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল সমাজনৈতিক বাধাকে অপসারণ করে। অবাধ

www.pathagar.com

যৌনতার ক্রমউন্নয়ন এবং কুমারীর সম্মান ও নারীর লজ্জা সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সংস্কারমুক্ত উদার জনগোষ্ঠী তৈরির ক্ষেত্রে এটা কি যথেষ্ট নয়?"[৪]

কতক পশ্চিমা বস্তুবাদী খ্রিষ্টীয় কৌমার্যের দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ব্যবস্থা ও যৌন অবদমনের মধ্যকার সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখে থাকেন। উইলহেম রেইক, ট্রটস্কী এবং তথাকথিত ফ্রাঙ্কফার্ট ঘরানা এই ধারণার ধারক। হারবার্ট মারকিউসের মতে পুঁজিবাদ যৌনশক্তিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্যেই যৌনতার অবদমন করে।

কৌমার্য বস্তুতপক্ষে খোদার প্রত্যক্ষ আদেশের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তথাপি কৌমার্য খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাধারণ অংশ। ভ্যাটিকান কাউন্সিলে কৌমার্য অপসারণ করার প্রচেষ্টা সহজেই প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু কৌমার্যের নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়; এটা চর্চিত হতে পারে কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যেই। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় যৌন স্বাধীনতার নানা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বিবাহকে পুনর্বহাল করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টবাদ সম্পূর্ণ কৌমার্য ও বস্তুবাদ সম্পূর্ণ যৌন স্বাধীনতার যে ধারণা নির্মাণ করেছিল তা থেকে উভয়েই প্রত্যাবর্তন করছে স্বাভাবিক বিবাহে। এ প্রক্রিয়ায় খ্রিস্টবাদ বিবাহকে মেনে নিয়েছে একটি অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন হিসেবে, বস্তুবাদ একে গ্রহণ করেছে শুধু একটি চুক্তি হিসেবে।

বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, ইসলাম বিবাহের উপরোক্ত দুই প্রেক্ষিতকে মসৃণভাবে সমন্বিত করেছে। ইসলামী বিবাহ একাধারে ধর্মীয় ও সিভিল; একই সাথে তা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও একটি চুক্তি। ইসলামী বিবাহে বিচ্ছেদ আসতে পারে, কারণ তা একটি চুক্তি, কিন্তু সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। নবী (সাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদকে বলছেন, "অনুমোদনযোগ্য সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য"– ব্যাপারটি চুক্তির সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তাকে যুক্ত করে। বিবাহ তাই প্রতীকীরূপেই একটি ইসলামী ব্যবস্থা।

ইসলামে বিবাহ একজনের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধান করে, দেখায় কিভাবে ভালবাসাকে অগ্রাহ্য না করেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়। ইসলাম যৌন উচ্ছৃংখল পশুকে ফেরেশতা বানাতে চায় না, মানুষ বানাতে চায়।

টীকা

১. Mark 5 : 27-28.

২. I Corinthians 7 : 38.

৩. I Corinthians 1-2.

৪. Engels : The Origin of Family. Private Property and the State.

www.pathagar.com

ইসলামবহির্ভূত 'তৃতীয় পন্থা'

অ্যাঙলো–স্যাক্সন জগৎ

ইওরোপ তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো রপ্ত করেছে মধ্যযুগের জটিল চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে। ভরা যৌবনেও ইওরোপীয় মানস থেকে তার শৈশবে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। ধর্মীয় কিংবা অধর্মীয় যা–ই হোক না কেন, ইওরোপ সব সময় খ্রিস্টান বিকল্পবৃত্তে চিন্তা–ভাবনা করেছে ঃ হয় খোদার রাজত্ব, না হয় বস্তুজগতের রাজত্ব। ইওরোপ হয় ধর্মকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, না হয় বিজ্ঞানকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইওরোপীয় ধর্ম ও ইওরোপীয় নাস্তিবাদ– উভয়েরই অবলম্বন স্বকীয়তা ও চরমপন্থা।

কিন্তু ইওরোপের একটি অংশ তার ভৌগোলিক অবস্থান ও তার স্বতন্ত্র ইতিহাসের কারণে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টবাদ এবং এই যুগের অন্যান্য প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে। পৃথিবীর এই অংশটি এক মধ্যপন্থায় একনিষ্ঠ থেকেছে যার সাথে 'ইসলামী তৃতীয় পন্থা'র সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমরা এখানে ইলংযান্ড তথা অ্যাঙলো–স্যাক্সন জগতের কথা বলছি।

বাইবেলের প্রথম আনুষ্ঠানিক ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা আরম্ভ হচ্ছে এই কথাগুলো দিয়ে ঃ "শুরু থেকেই অ্যাঙলিকান চার্চের প্রাজ্ঞতা হল দুই উগ্রধারার মধ্যবর্তী স্রোতটিকে অনুসরণ করা।" এই দৃষ্টিভঙ্গি ইংরেজদের ধর্মীয় ও বাস্তব জীবনের আদিসূত্রে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়, যেখানে যোগ হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ। নীটসের মত খাঁটি ইওরোপীয় ইংরেজ ও ইওরোপীয় মানসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন তাঁর এই বিখ্যাত প্রশ্নটি দিয়ে ঃ "How to save Europe from England and England from democracy?"

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে ইংল্যান্ড ও অ্যাঙলো–স্যাক্সন মননের আবির্ভাব প্রাচ্যের ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাবের অনুরূপক। এখানেই স্পেঙ্গলারকৃত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ক্রমওয়েলের মধ্যকার সাদৃশ্যের অর্থ নিহিত।[১] তাঁর বিশ্ব ইতিহাস দর্শনে এই দুই ব্যক্তিত্ব 'সমসাময়িকরূপে' আবির্ভূত। একীভূত ইংরেজ চার্চ ও রাষ্ট্র এবং ইংরেজদের বিশ্বক্ষমতা শুরু হয় ক্রমওয়েলের সাথে। তেমনি একীভূত ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলমানদের বিশ্বক্ষমতা শুরু হয় মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে। উভয়েই ছিলেন বিশ্বত্ত্বিবাদী ও বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ব্যাপারটি ইসলামী কিংবা অ্যাঙলো–স্যাক্সন মানসিতার নিকট খুব স্বাভাবিক, কিন্তু ইওরোপীয় মানসিকতার নিকট তা অদ্ভুত মনে হবে।

www.pathagar.com

লুইস দ্য পাইয়াস রাষ্ট্রকে তছনছ করেন কিন্তু ইসলামী জগতে যে কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সব সময় একটি ধর্মীয় উজ্জীবন সহযোগে শুরু হয়েছে। ইংরেজ সংস্কার আন্দোলনও একটিও অন্তর্মস্থিত যুক্তির আলোকে পোপ ও রাজা- উভয়ের প্রতাপকে ধ্বংস করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইওরোপের তুলনায় ইংল্যান্ড তখন ছিল বৈপ্লবিক। আজকের ইংল্যান্ড 'রক্ষণশীল'- কিন্তু রক্ষণশীল শব্দটি খাঁটি ইংরেজ মানসিকতারই প্রতিনিধিত্ব করে, ব্যাপকতর প্রযোজনায় যার অর্থ 'মধ্যপন্থা'।

বিলেতী জীবনধারার দ্বৈততাকে সে দেশের পরবর্তী চৈতন্যবাহী প্রগতির জনক রজার বেকনের উদাহরণ থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। প্রথমেই তিনি ইংরেজি দর্শন-চিন্তার সার্বিক অবকাঠামোকে দুটি আলাদা ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেনঃ অন্তরাভিমুখী অভিজ্ঞতা যা অতিন্দ্রীয় আলোকরাজ্যের নির্দেশক অর্থাৎ ধর্ম এবং পর্যবেক্ষণ যা সত্যিকার বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়। যদিও ধর্মের ওপরে জোর দিয়েছেন (যেমনটি ইসলামে দেওয়া হয়), মোটের ওপর বেকন একনিষ্ঠ দ্বৈতবাদীই থেকে যান এবং বিজ্ঞান বা ধর্মীয় কোন দৃষ্টিভঙ্গিকেই একে অপরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এই দুইয়ের মধ্যে তিনি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেন। অধিকাংশ ইংরেজ বেকনের এই ভাবনাকে ইংরেজ চিন্তা ও মননের যথার্থ অভিব্যক্তি বলে বিবেচনা করেন। অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তী সকল ইংরেজি দর্শন বেকনীয় চিন্তা-ভাবনারই ব্যাপকতর রূপ।

তবে বেকনের সাথে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপেক্ষিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা ও স্বীকৃতি মেলেনি ঃ ইংরেজি দর্শন ও বিজ্ঞানের জনক বেকন আরবী জ্ঞানভাণ্ডারের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশেষত ইবনে সিনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যাঁকে তিনি এ্যারিস্টটলের পর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[২] বেকনীয় চিন্তার মধ্যপন্থীয় প্রকৃতি, যা ইংরেজি চিন্তাভাবনাকে ইওরোপীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে পৃথক করেছিল, এই তথ্যটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

পরবর্তীতেও ইংল্যান্ড যে তার স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসেনি তার প্রমাণ জর্জ বার্নার্ড শ ও তাঁর ব্যক্তিত্ব। শ ছিলেন একজন কবি ও রাজনীতিক যিনি একই সাথে সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিবাদী ভাবনা প্রচার করেন। যুগপৎ ব্যঙ্গনবিশ ও মরমীবাদী, কঠোর সমাজ-সমালোচক ও ঘোর ভাববাদী হিসেবে লক্ষ্য করে একজন তাঁকে বলছেন, "an unrepeatable unity of contradiction."

বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। ইওরোপীয় ভূ-খণ্ডে একজন অভিজ্ঞতাবাদী নিয়মানুযায়ী একজন নাস্তিকও বটেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে অভিজ্ঞতাবাদের জনক জন লক তাঁর নীতিভাবনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন খোদার ধারণাকে এবং একজন

www.pathagar.com

ধর্মযাজকের মতই পারলৌকিক জীবনকে সমর্থন করেছেন।[৩] হবস একজন বস্তুবাদী ও দৃষ্টবাদী হয়েও প্রাকৃতিক নিয়ম ও বাইবেলের বাণীর মধ্যকার সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[৪] এটাই ইংরেজি চিন্তাধারার উদাহরণ। স্বভাবতই ইওরোপীয় চিন্তাবিদরা পরবর্তীতে একযোগে লকের মতবাদকে অসমর্থনযোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেন। তথাপি এটাই সত্য যে, লক, সেই সাথে বেকন ও হবস–এর বিতর্কিত দর্শনই ছিল ইংল্যান্ডের পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রারম্ভসূত্র।

প্রকৃতি ও নীতি ভাবনার মধ্যেকার যে খ্রিষ্টীয় বিরোধিতা তা ইংরেজ চিন্তাবিদদের চিন্তা দ্বারা অনেক কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত শ্যাপট্‌সবুরির মাধ্যমে এদের মধ্যে পুরোপুরি সখ্য স্থাপিত হয়। শ্যাপট্‌সবুরির নিকট নৈতিকতা হল স্বার্থপূর্ণ ও স্বার্থহীন আবেগের সম্মিলন। এই মিলনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে যদি স্বার্থ কিংবা স্বার্থহীনতা একে অপরের চেয়ে বেশি প্রভাবশীল হয়ে পড়ে। এখানে এ্যারিস্টটলের 'যৌক্তিক নৈতিক আত্মবাদ' ও কুরআনের কতক আয়াতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ইংরেজদের তথাকথিত কাণ্ডজ্ঞান দর্শন (Common sense philosophy) এবং Mill-এর সমাজ–ব্যক্তির মিলন সংক্রান্ত ফর্মুলাও এই প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাযোগ্য।

সুপরিচিত 'কেম্ব্রীজ গোষ্ঠী'র উদ্দেশ্যকেও খুব সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে "ধর্মতত্ত্বের বাস্তবিকীকরণ" হিসেবে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা কার্ডওয়ার্থ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জড্‌ল বলছেন, "দর্শন ও ধর্মের মধ্যে, ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বিবেচনা কেম্ব্রীজ গোষ্ঠীর আদর্শ। এই প্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে একই মানুষ একজন দার্শনিক হিসেবে নীতির যৌক্তিক সারমর্মকে শক্তিমত্তা সহকারে উপস্থাপিত করেন, আবার একজন ধর্মপ্রবক্তা হিসেবে একইভাবে ধর্মীয় মহিমময়তাকে তুলে ধরেন। এভাবে এমন একটি দর্শন পাচ্ছি যা আমাদের ধর্মীয় চাহিদা নিবৃত্ত করছে, আবার এমন ধর্ম পাচ্ছি যা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে যুক্তি ও উচ্চতর অনুভূতির রাজ্যে। এ রকম প্রস্তাবনাতে কেম্ব্রীজ গোষ্ঠীর সদস্যরা একমত হন।"[৫]

ইংরেজ মানস তথাকথিত উপযোগবাদী নৈতিকতার তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্ব করেছে। সাহিত্যে এটাকে বলা হচ্ছে "উপযোগবাদের বিলেতী (ইংরেজি অর্থে) নৈতিকতা"। বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে তা ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত হয়েছে "ধর্মতাত্ত্বিক উপযোগবাদ" নামে। "বিবেক ও অহম যদি সঠিকভাবে বোঝা যায়, তাহলেই সুখের ঠিকানা মিলবে।" – বাটলারের এই দাবি, হার্টলের যুগপৎ বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ব ও খোদার ধারণা এবং পালি ও রিচার্ড প্লাইসের বক্তব্যও একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা'র

www.pathagar.com

পালি (William Paley)-কৃত ধারণাটি, যা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল, খাঁটি ইসলামী পদ্ধতি এবং কুরআনের কতক বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬]

এই মধ্যপন্থী চিন্তানায়কদের মধ্যে আরেকটি বিশেষ সুপরিচিত নাম অ্যাডাম স্মীথ। তিনি যে দুটো বই লিখেছেন তাদের শিরোনাম আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধিতার আভাস দেয়। একটি 'The Theory of Moral Sentiment', অপরটি 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. দ্বিতীয় বইটি অষ্টাদশ শতকের সবচে' প্রভাবশালী বইগুলোর একটি। প্রথমটি নীতি সম্পর্কিত যার মূল কথা হল অনুবেদনা, মহানুভবতা এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক-অর্থনীতি সম্পর্কিত যার মূলে রয়েছে আত্মবাদের প্রশ্ন। এখানে মনে হতে পারে যে, আলোচ্য বই দুটির বিষয়ভাবনা পরস্পরবিরোধী, কিন্তু গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক স্মীথ নীতিবিদ্যা, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে একই দর্শনের সমন্বিত পাঠরূপে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রথমোক্ত বইটিতে এরকম বক্তব্য পাই ঃ "আত্মবাদ ও নৈতিক অনুভূতি-দুটোই বাস্তব। খোদায়ী ইতিহাসের বিশ্বজনীন প্রকল্পে দুটোই সংযুক্ত হয়েছে। মানুষ ভারসাম্য তথা সমন্বয়ের (Unity) দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক জীবনে সে তার মূল প্রকৃতি থেকে সরে আসতে পারে না।" টটোমিয়ান্স স্মীথের লেখায় স্ববিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক যেমনটি ইওরোপীয়রা স্ববিরোধিতা খুঁজে পায় কুরআন ও ইসলামের মধ্যে। পাদ্রীতন্ত্র ও ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতা বিষয়ে স্মীথ ও ডেভিড হিউমের যে বিরাগ তা অনিবার্যভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে। স্পেনসারের "Education"-কে মনে হয় একজন মুসলিম চিন্তাবিদ দ্বারা লিখিত। তাঁর চিন্তা-ভাবনা নমুনাগতভাবেই বিলেতী যখন তিনি দাবি করেন যে, নৈতিকতা মূলত ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সমঝোতা ('Principles of Ethics')

ক্যাথলিক ফ্রান্সে যখন আধ্যাত্মিক ও দৃষ্টবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটমান, তখন ইংরেজ জগতে কল্যাণ ও বিবেকের নীতির মধ্যকার ভারসাম্য ঠিকই বজায় থাকে। মিল (Mill)-কৃত ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতির মধ্যকার সমঝোতা এবং তাঁর এই অভিমত যে, সম্পদের কতক নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে তা যাকাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতাবাদের আধিপত্যের পর উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে মার্টিন, ব্রাডলী, গ্রীন প্রমুখের লেখায় যে নব্য ভাববাদের উন্মেষ ঘটেছিল তাও পূর্বেকার বিলেতী ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিলেতী সমাজতন্ত্রও বিশেষ প্রকৃতির। মূল ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্র বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, অথচ ইংল্যান্ডে "গীর্জার বেদী থেকে যেমন, বামপন্থী শ্রমিকের মঞ্চ থেকেও ভেসে আসে বাইবেলের উদ্ধৃতি।"-লিখছেন একজন বিস্ময়াভিভূত ফরাসি রিপোর্টার।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে দুই বিরোধবাচকতার মধ্যে মিলনের আরেকটি উদাহরণ মিলবে বার্ট্রান্ড রাসেল-এর নিকট থেকে যখন তিনি বলেন, "স্থায়ী ও সন্তোষজনক সামাজিক সংহতির প্রশ্নটি সমাধা হতে পারে শুধু রোমান সাম্রাজ্যের সারশক্তির সাথে সেন্ট অগাস্টিনের 'সিটি অব দা গড'-এর ভাববাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে।[৭] আরেক স্থানে, "ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, সত্য নিহিত রয়েছে দুই চরম চিন্তার মাঝামাঝি। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ভাব ও বাস্তব জীবনের মধ্যেও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বর্তমান।"[৮]

আমেরিকার প্রয়োগবাদী দর্শনের (Pragmatism) আধ্যাত্মিক উৎস এই প্রেক্ষাপটে খোঁজা যেতে পারে। এর দ্বৈততা, এর ধর্ম ও বিজ্ঞান-- উভয়েরই গ্রহণ (তাদের বাস্তব মূল্যের ভিত্তিতে) এবং তাদের এই স্বতঃসিদ্ধতা যে, জীবনের অভিজ্ঞতা সত্যের মানদণ্ড হওয়া উচিৎ-এটা প্রতীকী অর্থেই অ্যাঙলো-স্যাক্সন দর্শন এবং একই সাথে অ-ইওরোপীয়। উইলিয়াম জেমস এই দর্শনের সারকথা তাঁর 'Pragmatism' বইয়ে তুলে ধরেছেন। একটি উদ্ধৃতিঃ "আমরা মুদ্রার দু'পিঠেই ভালত্ব দেখতে চাই। বাস্তবতা ভাল, বাস্তবতা চাই। নীতি ভাল, নীতিও চাই। একদিক থেকে এ জগৎ নিঃসন্দেহে একটি ঐক্য, আবার আরেক দিক থেকে তা বহুধাবাচকও বটে। তা একই সাথে এক ও বহু। অতএব আমরা গ্রহণ করব এক ধরনের বহুত্ববাদী অদ্বৈতবাদ। অবশ্যই সবকিছু পূর্বনির্দিষ্ট, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। ইচ্ছা স্বাধীনতাময় অদৃষ্টবাদই যথার্থ দর্শন। অসততার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু একই সাথে সকলেই অসৎ হতে পারেন না। এ প্রেক্ষিতে বাস্তব নৈরাশ্যবাদ যুক্ত হতে পারে আধ্যাত্মিক আশাবাদের সাথে।"[৯]

বার্ট্রান্ড রাসেল বলছেন, "উইলিয়াম জেমস-এর দার্শনিকতার দুটো দিক ঃ একটি বৈজ্ঞানিক, অপরটি ধর্মীয়। বৈজ্ঞানিকতার ক্ষেত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনো তাঁকে বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকিয়েছে। কিন্তু সে ঝোঁক আবার ধর্মীয় আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।"[১০] এখন স্মরণ করা যেতে পারে, এই জাতীয় চিন্তাপ্রকরণ শুরু হয়েছিল সাত শ' বছর আগে রজার বেকনের দর্শন থেকে। অপরদিকে ইওরোপ অতিক্রম করেছে তার সম্পূর্ণ অধিবৃত্ত যার এক প্রান্তে সেন্ট থমাস একুইনাস, অপর প্রান্তে লেনিন।

আমরা যতটুকু জানি ইওরোপীয় মানসের নিকট প্রয়োগবাদী দর্শন অযৌক্তিক, বিশৃঙ্খল ও অসমঞ্জস্যরূপে আবির্ভূত হয়-যে সমস্ত দোষারোপ ইওরোপীয়রা সাধারণভাবে ইসলামে আরোপ করে থাকে।[১১]

এটা আশা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে ইওরোপ লাগামহীন বৈজ্ঞানিক প্রগতির সকল ফলাফল ভোগ করবে, কিন্তু ইংল্যান্ড ও আমেরিকা খুব সম্ভবত মাঝপথে থেমে যাবে

www.pathagar.com

(প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণে রেখে)। ইওরোপের জন্যে ধর্ম ধর্মই, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই। কিন্তু ইংল্যান্ডে চূড়ান্ত বিচারক দুই বাস্তবতাই অর্থাৎ এক কথায়, জীবন।

ঐতিহাসিক সমঝোতা ও সামাজিক গণতন্ত্র

'তৃতীয় পন্থা'র দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা ইওরোপের অন্যান্য অংশেও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা ইংল্যান্ডের উদাহরণের সাথে মেলে না। 'তৃতীয় পন্থা' যেখানে ইংরেজদের মনন ও মজ্জায় মিশে আছে, সেখানে ইওরোপের এসব অংশে 'তৃতীয় পন্থা'র আবির্ভাব হয়েছে বাস্তবতার চাপে, কোন বিশ্বাস বা অনুভূতির অংশ হিসেবে নয়। এই ব্যাপারটি আবার ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট দেশগুলোতে ভিন্ন ধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

যে সমস্ত দেশে ক্যাথলিক প্রভাব বেশি সে সব দেশে ধারণাগত মেরুকরণ অত্যন্ত জোরালো। এখানে 'মধ্যপন্থা'র দিকে অগ্রসর হওয়া কষ্টকর, নাটকীয় ও অনিশ্চিত। এ সমস্ত দেশ এক অর্থে 'তৃতীয় পন্থা' অবলম্বনে অসমর্থ। ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল সূক্ষ্মভাবে মেরুকৃত সমাজের উদাহরণ। গণমত এখানে অবিসংবাদিতভাবে দুই ধারায় বিভক্ত ঃ ডানপন্থী ও বামপন্থী। মাঝখানে যাঁরা আছেন তাঁরা হয় একেবারে সীমিত কিংবা নিশ্চিহ্নপ্রায়। ইতিহাসের দুই বিখ্যাত গোঁড়াতন্ত্র ক্যাথলিকতা ও কমিউনিজম এখানে পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতায় উভয় পক্ষ ক্লান্ত হলেও কেউ জয়ী হতে পারে না। গৃহযুদ্ধের ঠিক আগে স্পেন এরকম পরিস্থিতির একটি চমৎকার উদাহরণ ছিল। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে স্পেনের বামপন্থী দলগুলো ভোট পায় ৫১·৯০ ভাগ এবং ডানপন্থীরা পায় ৪৩·২৪ ভাগ। তৃতীয়পক্ষ পায় মাত্র ৪·৮৬ ভাগ। আজকের ইতালি ও ফ্রান্সও স্পেনীয় অনুপাতের অভিজ্ঞতা অর্জনকরেছে।

মজার ব্যাপার হল এ পরিস্থিতিতে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার আভাস পাওয়া যেতে লাগল শীঘ্রই।[১২] 'ধর্ম জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার মন্ত্র' – মার্কসবাদীদেরকে তাদের এই ক্লাসিক্যাল ফর্মুলা থেকে সরে আসতে হল এবং ক্যাথলিকরা স্বীকার করল মার্কসবাদী ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে।

সংলাপের এক পর্যায়ে "Paulus Gesel Ischaft" নামক একটি সংগঠন আয়োজিত সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল এরকম ঃ "মানব জাতির প্রতি খ্রিস্টীয় প্রেম এবং মার্কসীয় মানবতাবাদ" সালজবার্গ অধিবেশনে সুপরিচিত মার্কসবাদী লেখক Roger Garaudy[১৩] বলেন, "খ্রিস্টবাদ ইতিহাসে প্রথমবারের মত মানবগোষ্ঠীর জন্যে নিয়ে এল এক সীমাহীন আবেদন। এক অনাবিল প্রেমধারা, মানুষ অন্যের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দ্বারা নিজেকে যেভাবে সৃজন ও স্বীকৃত করে–তার চিত্র; তার ভাবমূর্তি ও তার জীবনের উদ্দেশ্য–সব কিছুর

www.pathagar.com

যোগ রয়েছে খ্রিস্টবাদে।" ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পালমিরো তগলিয়াতি মার্কসবাদীদেরকে ধর্ম বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। অপর দিকে পোপের দুই চিঠিতে (Pacem in Terris ও populorum progresse) আমরা এমন বক্তব্য পাই যা ক্যাথলিকতার জগতে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। এখানে ব্যক্তি মালিকানার ওপরে সামাজিক হস্তক্ষেপ, ভূমি সংস্কারের অধিকার, রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাইশতম চার্চ অধিবেশনে (দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল) মার্কসবাদকে তিরস্কার করার রক্ষণশীল নীতি পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রিপোর্ট পরীক্ষা করে এই কাউন্সিল স্বীকার করে, উগ্র আধ্যাত্মিক খ্রিস্টীয় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়। কার্ডিন চারডিন বললেন, "আমার মতে বিশ্ব খ্রিস্টীয় আশাবাদকে গ্রহণ করবে শুধু যদি খ্রিস্টবাদ বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করে, এ পথেই এর স্বর্গীয়করণ সম্ভব।" এখন বলুন, এটা "খ্রিস্টবাদের ইসলামীকরণ" নয় কি? ১৯৭৭ সালে Permanent Council of French Episcopate "মার্কসবাদ, মানুষ ও খ্রিস্টবিশ্বাস" শিরোনামে একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করে যেখানে উদারপন্থী সামাজিক রাজনীতির ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয়, "মার্কসবাদে সত্যের এমন কতক অংশ রয়েছে যা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে।"

মাত্র কয়েক বছর আগে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জর্জ ম্যাকেই তাঁর "Lyon Appeal" বক্তৃতায় এই ঘোষণা দেন, "আমাদের লক্ষ্য হল কমিউনিজম ও খ্রিস্টবাদের পারস্পরিক স্বীকৃতি দান এবং পরস্পরের মৌলিক বিষয়ে সশ্রদ্ধ হওয়া এবং একটি মহত্তর সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়নে পাশাপাশি কাজ করে যাওয়া।"

এই যে সমঝোতার প্রবণতা ও প্রস্তাব, তা কোন সাময়িক লক্ষ্য অর্জনের কৌশল নয়, বরং এটা একটি আন্তরিক পদক্ষেপ যা এই চৈতন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১৪]

প্রটেস্টান্ট দেশগুলোতে মধ্যপন্থীয় আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়েছে মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মধ্য দিয়ে। এ সমস্ত দেশ খাঁটি খ্রিস্টান কিংবা খাঁটি সাম্যবাদী সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঝুঁকেছে সামাজিক গণতন্ত্রের (Social Democracy) প্রতি। ক্যাথলিক সমাজ "ঐতিহাসিক সমঝোতা"র মাধ্যমে যে সমাধান খুঁজেছে, প্রটেস্টান্ট সমাজ তা সামাজিক গণতন্ত্রে খুঁজে ফিরেছে। সামাজিক গণতন্ত্র, ইওরোপে যার অর্থ উদারতাবাদ ও সামাজিক হস্তক্ষেপের সমন্বয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভ করে।[১৫] যুদ্ধের অব্যবহিত পরের নির্বাচনী ফলাফলের সাথে ২৫/৩০ বছর পরের নির্বাচনী ফলাফলের তুলনা করলে আমরা দেখব যে, মুক্ত নির্বাচনী পরিবেশে

www.pathagar.com

সামাজিক গণতন্ত্রের পক্ষে ভোটের সংখ্যা প্রায় সর্বত্রই বৃদ্ধি পেয়েছে। সুইডেনে ২২ ভাগ, ডেনমার্কে ৩৬ ভাগ, হল্যান্ডে ৫৪ ভাগ, নরওয়েতে ২৭ ভাগ, মাল্টায় ৩৪·৮ ভাগ ও পশ্চিম জার্মানীতে ১০০ ভাগেরও বেশি।

সামাজিক গণতন্ত্রে একনিষ্ঠ মেক্সিকো ও ভেনিজুয়েলা অস্থিতিশীল দক্ষিণ আমেরিকার তুলামূলকভাবে দুই স্থিতিশীল দেশ। অর্থনৈতিক উন্নতি জাপানকে মেরুকরণের দিকে ঠেলে দেয়নি, বরং জাপানকে আরও কেন্দ্রাভিমুখী করে তুলেছে। 'মধ্যপন্থা'–এই শব্দটি এখন জাপান ও মেক্সিকোর রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুলশ্রুত। ১৯৭৬ সালে কারাকাসে অনুষ্ঠিত সামাজিক গণতন্ত্রীদের সম্মেলনে মেক্সিকোর প্রতিনিধি গনজালেস সস তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান বিশ্বে তিনটি বৃহৎ রাজনৈতিক বিকল্প রয়েছে–পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্র। মেক্সিকোকে এর মধ্য থেকেই তার পথ বেছে নিতে হবে।"

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ চাপা উত্তেজনা শুধু সাম্যবাদী অর্থনীতির ত্রুটির সাথে যুক্ত নয়, সমস্যাটি মানব মনের স্বাভাবিক আকুতির সাথেও সম্পর্কিত। এখানে সকলেই এক ধরনের সমাজতন্ত্র চাইছে যা নাস্তিবাদ ও একনায়কত্ব থেকে মুক্ত হবে, যাকে বলা যায় মানবিক চেহারার সমাজতন্ত্র।[১৬] উদাহরণস্বরূপ, চীনে মাওসে তুঙ–এর মৃত্যুর পর বেতোফেন, সেক্সপিয়ার প্রমুখের শিল্পকর্ম থেকে ধীরে ধীরে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়; তেমনি রাশিয়াতেও এক সময় দস্তয়েভস্কি, শেগাল, কাফকার ওপর থেকে তুলে নিতে হয় নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল। স্বাধীনতার দাবি আরও উচ্চকিত স্বরে উত্থিত হচ্ছে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলোতেও। ধীরে ধীরে হলেও সবকিছু সেদিকেই এগোচ্ছে। প্রবণতাটি অত্যন্ত পরিষ্কার।

এদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সাম্যবাদের ছায়াপাত ঘটেছে, যেখানে ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপের আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবতার কারণেই একদিকে যেমন সোভিয়েত আর্থিক ফার্মগুলোকে কঠিন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনা হচ্ছে, তেমনি আমেরিকার ফার্মগুলোর সামাজিকীকরণ করা হচ্ছে। অধ্যাপক Wiedenbaum সমকালীন আমেরিকার কর্পোরেশনগুলোকে "অর্ধরাষ্ট্রীয়কৃত" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৭৫ সালে কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র, ইওরোপ ও জাপানের প্রভাবশালী সরকারি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনটি সংশ্লিষ্ট ছিল অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর 'অতি গণতন্ত্রে'র বিড়ম্বনার সাথে। এই সম্মেলনে প্রণীত রিপোর্টে (Crisis of Democracy) পরিমিত গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দেওয়া হয় এবং সেই সাথে প্রচার মাধ্যমের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় কতক পরিমাণে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দিকনির্দেশ করা হয়।

এই সমস্ত আয়োজন ও সিদ্ধান্ত ইসলামের সাথে মিললেও তা ইসলামী নয় এবং ইসলামের দিকেও এগোচ্ছে না। কারণ এখানে সিদ্ধান্তগুলো জোরপূর্বক নিঃসৃত যা ত্রুটিপূর্ণ ও

www.pathagar.com

অসমঞ্জস্য। ইসলাম সচেতনভাবেই একরৈখিক ধর্মীয় বা একমুখী সামাজিক প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বৈততার (দ্বিপ্রান্তিকতা/মধ্যপন্থা/সমন্বয়) নীতির প্রতিনিধিত্ব করে। তথাপি আমরা বলতে পারি যে, পূর্ববর্তী একমুখী গোঁড়া মতবাদগুলোর বিচ্যুতি, দ্বিধা, অতঃপর অনিবার্য পারস্পরিক সমঝোতা জীবন ও সহজাত মানবিক বাস্তবতার বিজয় সূচিত করে এবং এ প্রেক্ষিতে তা ইসলামেরই পরোক্ষ বিজয় বটে।

টীকা

১. Spengler : The Decline of the West.

২. Bertrand Russell: ibid., pp 452-453; তাছাড়া যুক্তিবিদ্যার বিস্তারিত ইতিহাসের লেখক Karl Prant একই কথা বলছেন : "Roger Bacon has taken over from the Arabs all the results in the field of natural sciences which has been attributed to him."

Geschicte der Logic. III, Leipzig, 1972, P. 121.

৩. John Locke : Essays on Human Understanding, Book II. Chapter 28, par loandoh এবং Book iv, Chapter 10.

৪. De Cive., Chapter IV.

৫. Frederick Jodl : The History of Ethics, P. 145.

৬. Paley : Natural Theology.

৭. Russell : Op. Cit., P. 505.

৮. Ibid., P 620.

৯. William James : Pragmatism, P. 16.

১০. Russell : Ibid., P. 774.

১১. Dragosh Kalaich তাঁর "Actuality of Islam" শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করছেন যে, প্রয়োগবাদ ইসলামী ঐতিহ্যেরই অপরিহার্য অংশ। Delo, Belgrade. No. 7. 1978,P. 62.

১২. আমি যতদূর জানি এ জাতীয় সমঝোতামূলক সংলাপ প্রথম শুরু হয় ১৯৬৫ সালে, মালবার্জ শহরে। উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিম জার্মানির উদার ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিকেরা।

১৩. Roger Garaudy এখন একজন মুসলমান।

১৪. বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় কতক ইওরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি ডকুমেন্ট থেকে Dictatorship of the Proletariate বা "সর্বহারার একনায়কত্ব"-এই শব্দগুচ্ছ বাদ

www.pathagar.com

দেওয়া থেকে কিংবা আমরা যখন দেখি যে, ইতালিয় কমিউনিষ্ট পার্টির সংবিধানে অবিশ্বাস্যভাবে বলা হচ্ছে, "ধর্মীয় ও দার্শনিক বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, যে কেউ পার্টির সদস্য হতে পারবে।" Article-2 of the statute of ICP.

এদিকে মাওসেতুং-এর মৃত্যুর পর চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিত্যাগ করাও একই প্রেক্ষিতে বোঝা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইউটোপিয়া বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। চীন এক পায়ের ওপর ভর করে (অর্থাৎ উগ্র বামপন্থার নীতি) বড় জোর দশ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল; অতঃপর অনিবার্যভাবেই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। আমরা এখন চীনে বামপন্থা থেকে মধ্যপন্থায় অগ্রসরতার চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

১৫. কিন্তু এই জগতের আদর্শিক মৌলবাদী অংশ এই বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চায় না। মস্কোর পত্রিকা The Communist ঘোষণা করে (জুলাই, ১৯৭৯) যে, "মধ্যপন্থা" অসম্ভব। এই পত্রিকার মতে তৃতীয় তত্ত্ব A Third Theory বলে কোন বিকল্প সম্ভবপর নয়। পথ মাত্র দুটোই-পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক।

১৬. Maurice Diverger পশ্চিমে অনিবার্য সামাজিকীকরণ এবং পূর্বে অনিবার্য উদারপন্থার বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, Introduction a la Polique, Gallimard, Paris 1970, P. 367.

www.pathagar.com

সম্পূর্তি ঃ স্রষ্টার নিকট আত্মনিবেদন

প্রকৃতির আছে নিয়ন্ত্রণবাদ, মানুষের আছে নিয়তি। এই নিয়তিকে বরণ করাই ইসলামের চরম ও পরম ধারণা।

এই নিয়তির রূপকাঠামো কেমন? আমাদের শৈশবের রঙীন স্বপ্ন ও সাধের কথা ভাবা যাক, তার সব কি পূরণ হয়েছে? এ পৃথিবীতে কারও আগমন সোনার চামচ মুখে নিয়ে, কারো আগমন কুঁড়েঘরে; কেউ বোকা, কেউ বুদ্ধিমান; কেউ জন্মগ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ সময়ে, কেউ অশান্ত সময়ে কেউ স্বৈরাচারীর আমলে, কেউ মহান দেশনায়কের আমলে কিংবা ভূগোল ও ইতিহাসের কোন চিহ্নিত পর্বে–সামান্য নড়চড় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ, আর আমাদের নিয়তি কত সীমাহীন ও সর্বব্যাপ্ত!

মানুষের জীবন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় কারণ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৪ সালে ইওরোপে মিত্র বাহিনীর আক্রমণের সময় মুহূর্তকালের জন্যে রেডিও যোগাযোগে অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যা আরও কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হলে চলমান অপারেশন ভিন্ন খাতে মোড় নিতে পারত। অনেক কাল পরে জানা যায়, ঐ অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার কারণ ছিল কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত Andromeda নামক নক্ষত্রপুঞ্জে একটি ব্যাপক বিস্ফোরণ। এদিকে এক ধরনের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কারণ হল সূর্যপৃষ্ঠে পরিবর্তন। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বাড়ছে ততই উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমরা কখনোই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হতে পারব না, এমন কি বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিকাশ পর্বের কথা কল্পনা করেও বলতে পারি, মানুষের অধিগত যতটা থাকবে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে তার ক্ষমতার বাইরে। পৃথিবীর প্রগতির সাথে মানুষের ভাগ্য আনুপাতিক নয় এবং তার জীবনকাল বস্তু ও স্থানকালের সাথে ঐকমন্ত্রে আবদ্ধ নয়।–এটাই মানুষের শাশ্বত অনিশ্চয়তার কারণ, যা প্রতিফলিত হচ্ছে একদিকে বিমর্ষবাদ, দ্রোহ, হতাশা, বিতৃষ্ণা, আরেকদিকে খোদার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

ইসলাম এই জগৎ ব্যবস্থাপনা করছে অন্তর্চেতনার উন্মেষণা, শিক্ষা ও আইন সহযোগে, এবং এটা হল এর সংকীর্ণ পরিসর। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণই বৃহত্তর ধারণা।

ইহজগতে ব্যক্তিগত ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে সাধনযোগ্য নয়। ইসলামে তাই 'দুই জগতে'র সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান। আমরা নৈতিকভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি, কিন্তু নিয়তির জটে পড়ে আমাদের শরীর ও আশা ভোগান্তির শিকার হবে না–এ নিশ্চয়তা নেই। যে মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে কিসে? যে মানুষটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেছেন তাঁর জন্যেও কি কোন সান্ত্বনা আছে? "আমাদেরকে আমাদের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। আমরা পারিপার্শ্বিকতার আবর্তে নিমজ্জিত। আমি আমার পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এমন কতগুলো পরিস্থিতি রয়েছে

www.pathagar.com

যা মূলত অপরিবর্তনীয়ঃ আমি মরণশীল, আমি যন্ত্রণাকাতর, আমি সংগ্রামী, আমি দৈবের শিকার। আমি অনিবার্যভাবে পাপপ্রবণতার সাথে যুক্ত। আমাদের অস্তিত্বের এই মৌলিক পরিস্থিতিগুলোকে বলা হয় 'প্রান্তিক পরিস্থিতি' (the border situation)"[১] এই পৃথিবীতে যা কিছু পরিবর্তনসাপেক্ষ মানুষ তার পরিবর্তন করতে বাধ্য, কিন্তু তারপরেও উন্নততম সমাজে শিশুর অকাল মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। মানুষ মোটের ওপর যা করতে পারে তা হল ইহজাগতিক দুঃখ-কষ্টকে গাণিতিকভাবে হ্রাস করতে। কিন্তু অবিচার ও অসঙ্গতি চলতেই থাকবে। এবং তা যতই কম হোক না কেন, "they will never cease to be blasphemy.[২] স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ বা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল একই সঙ্কটের দুই রকমের সমাধান।

একজন মানুষের পক্ষ থেকে অক্ষমতা ও অনিশ্চয়তার স্বীকারোক্তির পর খোদার নিকট তার আত্মসমর্পণ তার জন্যে নতুনতর সক্ষমতা ও নতুনতর নিশ্চয়তাকেই আনয়ন করে। খোদা ও তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস মানুষকে যে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয় তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। খোদার প্রতি আত্মসমর্পণের অর্থ নিষ্ক্রিয়তা নয়- যদিও অনেকে তা-ই মনে করেন। "সকল বীর জাতি অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল", বলছেন ইমারসন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য মানুষের প্রতি আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। এটা সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যকার, ফলত মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের সূত্রসেতু। সৃষ্টিকর্তার নিকট আনুগত্য এক ধরনের স্বাধীনতাও বটে যা মানুষ অর্জন করে নিয়তির পথ পরিক্রমণ করতে করতে। জীবন সংগ্রামে আমাদের অংশ গ্রহণ মানবিক ও যৌক্তিক এবং তা সত্যিকার সৌকর্য-সংহতি অর্জন করে যখন আমরা বিশ্বাস করি, চূড়ান্ত ফলাফল আমাদের হাতে নয়। কাজ করে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের, বাদ বাকি আল্লাহ্‌র হাতে।

কাজেই পৃথিবীতে আমাদের সঠিক অবস্থান বোঝার ব্যাপারটি সৃষ্টিকর্তার নিকট আত্মসমর্পণের সাথে যুক্ত। জীবনের অর্থহীনতার বোধ, দ্রোহ, নিরাশা, নাস্তিবাদ কিংবা আত্মহত্যা থেকে সরল সহজতা ও স্বাভাবিকত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র উপায় মহান আল্লাহ্‌র নিকট আত্মনিবেদন। এটা কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়, বরং তা এক সাধারণ মানবমনের আকুতি যিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এবং তাঁর ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছেন।

'ইসলাম'-এই নামটি ইসলাম তার আইন-কানুন, নির্দেশনা বা বিধি-নিষেধ থেকে পায়নি, বরং এমন কিছুতে এর সারসত্য নিহিত যা সব কিছুকেই বেষ্টন করে, অতঃপর সেগুলোকে অতিক্রম করে যায় ঃ আর তা হল আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ!

Submission to God, thy name is Islam!

টীকা

১. Karl Jaspers : An Introduction to Philosophy.

২. Albert Camus : L' Homme Revolte....

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ইসলাম

www.pathagar.com

Islam Between East and West is the result of a comprehensive multidisciplinary study of the leading world views in the contemporary history of mankind. The phenomenon of self-forgetfulness which characterizes the modern history of the Islamic world puts both the eastern and western intellectual in the same position in relation to this book.

Through comparative studies of the basic premises and consequences/social, legal, political, cultural, psychological, and so on/ of two ideologies which have defined the destiny of mankind for serveral of the last centuries, the author reveals the symptoms of the increasingly dramatic perspective of Christianization and atheization of the world. Christianity as a paradigmatic cultural religious phenomenon/ that is, religion in its Occidental meaning, alienated from the Act of Revelation/ is a generic idea of the creation, culture, art, and morality. As such, it aspired to spiritualization of history. Atheization, however, based on a materialistic approach with socialism being its practical and historical perspective, is a common denominator of evolutionistic, civilizational, political and utopian elements which take care of the physical nature of man and history.

Dramatically divided into spirit, in the vision of Christianization, and into matter, in the praxis of atheization, the modern man has found himself on a historical razor edge from which the Islamic teaching of synthesis has proven to be the only possible model. As such, Islamic teaching of synthesis has proven to be the only possible model. As such. Islam is more a need rather than a question of choice. Some elements similar to the original Islamic teaching discovered by the author in the Anglo-Saxon world are not the sign of conscious conversion of that world, but an imperative of inner logic, which the modern world will have to understand more.

Symptoms such as family disintegration, the increase of social vices, crime, and prositution, neuroses and general hopelessness appear in both of the previously mentioned leading systems, point to the same etiology of the disease, though with different signs. Neglecting the act of God's Creation, the atheistic teaching reduces man to a perfectly drilled member of the society, de-personalized and de-spiritualized, and thus deprived of any wish to rebel. On the other hand, the Christian man, spiritualized but bodiless, has turned his rebellion into an almost aesthetic act, sublime in art, but futile and inhuman in practice and everyday life.

Restituting the Islamic thought as the thought on bipolarity, the author has pointed to the fatigue existing in the minds of both materialistic and religious provenance who are increasingly ready to admit the one-sidedness of their approaches, but who, nevertheless, keep on closing their eyes even when the latest historical events warn us in the most evident way. However, the

www.pathagar.com

"Islamic fever" is a historical fact, and the submission to God which semantically explains the notion of Islam, is the only dignified human choice in the destiny of an individual, this destiny being but a mirror of the cosmic destiny.

Hassan Karachi

পরিশিষ্ট–২ ঃ ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

The writer of this book Alija Ali Izetbegovic, a lawyer from Sarajevo, Yugoslavia, comes from South Slav which for more than 500 years belonged to Islam. He views his environment, therefore, whith an Islámic frame of mind. Nevertheless, he charts his own course-daring but fascinating.

Closest to his heart, appears to be a desire to offer the younger generation of Muslims of the world implements for orientation.

Ali Izetbegovic has meanwhile entered into the history of Islam in Bosnia. In August 1983, he, together with eleven Bosnian intellectuals/ among them one poetess/, was sentenced to 14 years in jail for his "fundamentalist digressions" by a court in Sarajevo. Evidently the Communist rulers in Yugoslavia see in the philosophy of our writer a great threat to their current order.

As a Bosnian Muslim who has been struggling for several decades to preserve Islamic faith under the strenuous conditions of secularized society, I accept with great pleasure this opportunity to point to an intensive concept of Islam in the hearts and minds of Bosnian Muslims.

Neither Ali Izetbegovic nor any of the defendants-from the 1983 Sarajevo's trial-have any political goals or interst in politics in their life's circle. Nor in the least can they be accused of any intentions against the state or against the people/ as stated by the court.

For the clarification of some key issues and possible criticism of the book's content... these are the views of a group of enlightened Muslims gathered around the publication "Islam and West", printed in Vienna. This publication is, in fact, the only organ of Bosnian Muslims in the FREE WORLD. It is printed mainly in German and Bosnian/ Serbo-Croatian/languages.

Here are some of these views, presented without any pretence to systematization of completeness:

In secularized Europe, the cry "back to our origins", which is shaking the Islamic world in our days, can only be interpreted as a challenge to us to carefully examine our Islamic and cultural heritage and to jettison the accumulated historical ballast of centuries, which is a hindrance to progress. If undertaken in a realistic and independent way, this return to our origins in not

www.pathagar.com

likely to give rise to reactionary movement. On the contrary, it can be expected to lead to a purer understanding of Islam.

Islam cannot mean submission to the tyranny of history; on the contrary, it means a continuing obligation to order life in any given situation in accordance with the needs of the time and in total *submission to God*. This calls for a greater emphasis on the universal dimension of Islam, which actually regards Judaism and Christianity as its carlier manifestations.

The innate propensity of Eastern people to cling to long established thought patterns, a charge already brought against the Arabs by the Qur'an itself, is a hindrance to a modern Islamic education based on scientific knowledge-an essntial element for Muslims in their witness to God. A change has long been overdue here. Only if we grow out of *blind* submission to the doctrinal authority of our ancestors, can new perspectives be opened up.

Even in secularized Europe, Islam will hardly let itself be persuaded to regard God as primarily "Lord of history" In the view of Islam and thus not only of history, but also of pre-history and "post-history", the restricted view of God from a human standpoint alone is obviously a source of anthropocentrism, which has led in the end to a distorted view of humankind itself. As a consequence, humankind is dangeroulsy far from the order willed by God.

Islam offers its adherents many ways of coping with life in secularized society. Mention may be made, for example, of the absence of sacraments, of a priesthood and of baptism, the civil nature of marriage, the natural approach to sexuality, the rejection of the idea of excommunication, the positive attitude to knowledge and scientific research, the relative toleration of mixed marriages, and the long-standing readiness for dialogue with the monotheistic religions.

Blind progress that does not take its bearing on any firm valuational framework risks leading to decultivation and loss of personality. The effects of such dedication to the Zeitgeist manifests itself, for example, in the case of the Jews. That is why Martin Buber has already warned: "If you become like other peoples, you no longer deserve to be".

Taking into account the undeniably existing will of Islam toward improvement of the world, it becomes evident that it is a fallacy to attribute fatalism to Islam. Fatalism is more likely to be met in the view of life shaped by modern psychology and based on a fatal reductionism of all human dimensions to environmental influences. This reductionism does not ask what the meaning of life is and does not encourage man to develop the will to give life meaning, but tells man that he is the victim of curcumstances. "That is grist to the mill of mass neurosis, because fatalism is part of the symptomatology of mass neurosis". a reputed sholar holds.

As is known, the zenith and ultimate act of the spiritual side in Muhammad's life was his visionary flight into the heavenly spheres

www.pathagar.com

mentioned in the Qur'an under the name of *Mi'raj*. This example of the spirituality of Muhamman, upon whom be peace, indicates the direction in which the live of a Muslim should move. This direction clearly is vertical.

Religiousness that understands its culmination to be in the heavenly ascent-the Mi'raj- can be but bent toward God. It is dynamic, uplifting, and open-minded because it is not bound by tradition and custom. In Islamic philosophy which flourished until the end of the 13th century, and sporadically even later, the thought persisted that science had to be in accord with revelation-a view firmly held by Ibn Rushd/Averroes, died in 1198/. The course of Islamic cultural history shows convincingly that religion and science can in fact be in accord.

The writer of this book, who also wrote the Islamic Deciaration-the subject of frequent publicity in the international media and the main argument against the defendants at Sarajevo trial-attempts to build on its inherited spiritual ground and alternative to capitalism and dialectical materialism. That is however nothing new for the Islamic World. Ali Izetbegovic brings a refreshing new approach to this tradition.

The treatment as well as the methodology of problematics is the legitimate and rightful property of the writer. Within the framework of these two elements/ approach and method / the author's specific life philosophy has found its form. This specific philosophy appears also in the pages of this book.

Because of the sudden and unexpected arrest of the author- the academic apparatus of the book (bibliography and reference) have remained unfinished. The sources somethimes and even titles of the quoted books are incomplete ... and it is not clear, whether the author quotes the original or the translation of some book.

Considering the exrraordinary circumstance under which this book is published- it is hoped that the reader will pardon these weaknesses. I am sure this will not detract from its immense appeal.

Dr. S. Balic
Institut Fur Geschichte der Arabisch- Islamischen Wissenschaften
Ander Johann Wolfgan Goethe- Universitat
Frankfurt Am Main

www.pathagar.com

ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ ১৯২৫ সালে উত্তর বসনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন কেটেছে সারায়েভোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তিনি মার্শাল টিটোর সাম্যবাদী সরকার কর্তৃক ধর্ম চর্চার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করেন। ফলস্বরূপ তাঁকে ১৯৪৯ সালে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মুক্তির পর প্রায় পঁচিশ বছর আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকার পর অবসর গ্রহণপূর্বক ইসলাম, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৮৩ সালে একজন মহিলা কবিসহ এগারোজন মুসলিম বুদ্ধিজীবীর সাথে তাঁকে পুনরায় চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এবারে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয় বর্তমান বই 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম' (বইটির মূল বিষয়বস্তু সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। পরবর্তীতে বইটির পাণ্ডুলিপি গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করা হয় এবং American Trust Publications কর্তৃক 'Islam Between East and West' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে প্রয়াত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস মিঁতেরা বইটির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন)। অবশ্য পূর্ব ইওরোপে সাম্যবাদের পতনের মুখে ড. আলীয়াকে ১৯৮৮ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৯০ সাল নাগাদ যুগোস্লাভিয়ায় গণতন্ত্রায়নের ক্রান্তিকালে তিনি Party of Democratic Action গঠন করেন এবং বিপুল ভোটে বসনিয়া-হারজেগোভিনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বসনীয় জনগণের ইচ্ছেক্রমে বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। পরবর্তী ইতিহাস কমবেশী সকলেই জানেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি আকস্মিকভাবে সার্বীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং তাঁর প্রাণনাশের আশংকা দেখা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বজনমতের চাপের মুখে সার্বীয়রা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গোটা ইওরোপে গত কয়েক দশক ধরে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। 'যেখানে মসজিদ ও টেলিভিশন ট্রান্সমিটার থেকে বিপরীতধর্মী বাণী প্রচারিত হয় সেখানে কী ভাল আশা করা যায়?'-সত্তর দশকের প্রথম দিকে তাঁর লিখিত 'Islamic Declaration'-এ এই বাক্যটি থাকায় ইওরোপীয় ও সার্বীয় পণ্ডিত ও রাজনীতিকগণ তাঁকে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'মৌলবাদী' হিসেবে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর বই 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম' প্রমাণ করে যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে জগৎ জীবনের বৃহত্তম ক্যানভাসে যাঁরা ধর্মকে আঁকতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান নিশ্চয়ই প্রথম সারিতে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ Problems of Islamic Revival (1981), Meditation in Prison (1995).